মেকার

– মুন্নি

মাথা ধরা থাকে। তাই ডাক্তার দেখিয়ে চশমা কিনে দিয়েছিলেন বাবা।

নতুন চশমা চোখে দেয়ায় কেমন জানি লাগছিল। মনে হয় চোখের ওপর ভারী কি যেন রাখা হয়েছে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বান্ধবীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করতে গিয়ে চশমার একটি কাচ ভেঙে গেল। কি আর করা! বাবাকেও বলা যাবে না। তাই চশমা ঠিক করতে এলাম।

চশমার মেকার খুব হ্যান্ডস্যাম। বয়সও কম। পচিশ ছাব্বিশ হবে।

মেকার চশমা হাতে নিয়ে বললো, চশমার কাচের দাম ও মুজুরিসহ দেড়শ টাকা লাগবে। এবং তুমি যদি এখনই চশমা নিয়ে যেতে চাও তাহলে এক ঘণ্টা বসতে হবে।

মেকার আমাকে তুমি করেই বললো।

মেকারকে বললাম, আমার কাছে তো এতো টাকা নেই। শুধু পঞ্চাশ টাকা আছে। যদি একশ টাকা বাকি দেন তাহলে আস্তে আস্তে শোধ করে দেবো।

মেকার তার দোকানের একটি কাগজ দেখিয়ে দিল আমাকে। দেখলাম কাগজটিতে লেখা, *বাকিতে বন্ধুত্ব নষ্ট।*

লেখাটা দেখে আমার মুখটা মলিন হয়ে গেল। ভাঙা চশমা নিয়ে বাড়ি ফিরলে বাবার হাতে মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। মেকারকে বললাম, বাকি না দিলে চশমা দিয়ে দেন। বাবার শাসনের ভয়ে আমার কান্নাও পাচ্ছিল।

হঠাৎ মেকার বললো, ঠিক আছে, চশমাটা দাও। তুমি বসো, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

চশমা ঠিক করার ফাকে ফাকে আমার নাম ঠিকানা সব জেনে নিচ্ছে। তার কথা, হাসি আমারও কেন জাানি ভালো লাগছিল।

চশমা ঠিক করা শেষে হাসি মুখে চশমা তুলে দিল আমার হাতে।

পঞ্চাশ টাকা হাতে দিলাম।

আমাকে বললো, মাঝে মধ্যে এসো। খেয়াল রেখো, বাকিতে যেন বন্ধুত্ব নষ্ট না হয়।

আবার দেখা হবে বলে চলে এলাম। মেকারের টাকা শোধ করতে হবে। তাই প্রতিদিনের টিফিনের টাকা জমাতে শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর মেকারের টাকা শোধ করে দিলাম। বন্ধুত্বের টানে চশমার মেকারের কাছে প্রায়ই ছুটে যেতাম। বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হলো। এভাবে ছয় মাস কেটে যাওয়ার পর বড় আপুর কাছে আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়ে যায়।

মা, বাবা ও ভাইয়াকে বড়আপু জানান। আমার ওপর বাড়ে নজরদারী।

এক পর্যায় আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ। তারপরও চশমার মেকারের ভালোবাসার টানে শাসন ভেঙে ছুটে যাই। দেখা করে আবার ফিরে আসি। ফিরে আসার পর বাবার লাঠির পিটুনিতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ভাইয়া আমার মাথার চুল কেটে দিলেন। ঘরের সবারই অমানবিক অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে যাই। ঘরের সবার একটাই কথা, সামান্য চশমার মেকার। সে কি তোকে খাওয়াতে, পরাতে পারবে!

কথায় কথায় চশমার মেকার সম্বন্ধে বাজে উক্তি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ভাইবোনের ঘৃন্যতম কথায় বোবা হয়ে যাই।

আমার বড় বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে অনেক আগে। অথচ কেন জানি বিয়ে হচ্ছে না। জানি না তার কেন আমাকে নিয়ে হিংসা হয়। ভাইয়া পড়েন অনার্সে। ভাইয়াও পাষাণ।

আমার জন্মের সময় মা মারা গিয়েছিলেন। বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। ঘরে সৎ মা। যদিও সৎ মায়ের থেকে কখনো খারাপ ব্যবহার পাইনি। ঘরের পরিস্থিতি অনুমান করে বুঝলাম পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

বাবা, মা, ভাই ও বোনের মায়া ছেড়ে পালিয়ে গেলাম চশমার মেকারের হাত ধরে। হয়তো ভাইয়া ও অন্যরা আমাকে খুঁজেছেন। তবে ফিরিয়ে আনতে নয়, অত্যাচার করতে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তাদের হাত থেকে বেচে যাই। পালিয়ে বেড়াই চশমার মেকারের সঙ্গে।

অবশেষে অপরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে আমাদের বিয়ে হলো। অগোছালো ঘরে হয় অনাকাঙ্ক্ষিত বাসর। শ্বশুর আমাদেরকে মানতে চান না। কারণ শ্বশুর সরকারি চাকরিজীবী। মামলা মোকদ্দমার আসামি হলে চাকরি চলে যাবে।

মাস দেড় দুই শেষ হলে শ্বশুর খোজ নিয়ে জানলেন বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কোনো মামলা হয়নি। আমার বাবার কাছে লোক পাঠালেন, সমস্যা সমাধানের জন্য।

কিন্তু বাবা বলে দিলেন তার কোনো মেয়ে নেই।

এ কথা শোনার পর শ্বশুর আমাকে ঘরে তুলে নিলেন। ঘরের সবাই আমাকে আপন করে নিলেন। শাশুড়ি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন।

আমিও সবার সঙ্গে মিশে গেলাম।

শ্বশুরবাড়ি থেকে মাঝে মধ্যে ছুটে আসি মামাকে দেখতে। আপন মামা না হলেও আপনের চেয়েও বেশি। মামাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরে কাদি।

মামাও কাদেন। মামার কাছে জানতে চাই মা, বাবা, ভাইয়া, আপু কেমন আছেন? তারা কি জানতে চান আমি কেমন আছি?

মামা কেদে বলে, তারা তো তোর নাম মুখেও আনে না।

মামা, আমি কেন তাদের মতো ভুলে থাকতে পারি না? মামা তারা কেন সবাই এমন হয়ে গেল? তাদের কি এতিম আমার জন্য একটুও মায়া হয় না?

মামা বলেন, তারা তো পাষাণ হয়ে গেছে। তারা শুধু বলে, থাকুক চশমার মেকারের সঙ্গে। ওতো আমাদের কেউ না।

আমার চশমার মেকারও এখন কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। শ্বশুর ফরম ফিলআপের টাকা দিলেন। আমিও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

আমার মেকার বলে, তুমি দেখিয়ে দাও, আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল করোনি।

সবার ভালোবাসায় ভুলে থাকি সকল দুঃখ। আমি জানি, পৃথিবীর সকল মানুষের মতো আমার চশমার মেকারও রক্তে মাংসে গড়া একজন ভালো মানুষ। বাবা ও ভাই-বোনের অবহেলায় কি আসে যায়! সবার দোয়ায় আল্লাহ তো আমাকে চশমার মেকারের সঙ্গে ভালোই রেখেছে।

হাজিপাড়া, গৌরনদী, বরিশাল থেকে

বোকা

– সাঈম চৌধুরী

আমার চেহারার কোথায় জানি একটা বোকা বোকা ভাব আছে। কোথায় সেটা আমি ঠিক ধরতে পারি না, অন্যরা অবশ্য সহজেই ধরতে পারে। কিছু সময় কথা বলে অবাক চোখে আমার দিকে তাকায়। এই তাকানোটাই বলে দেয় লক্ষণ ভালো নয়, আমাকে বোকা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

বাবার ধারণা, ব্যাপারটা আমার স্মার্টনেসের অভাব।

স্মার্টনেসের সংজ্ঞাটাও আমি ঠিক জানি না। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আমার একটুও ভালো বলে মনে হয় না, আচার-ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করি অথচ সেই মানুষ সম্পর্কে অন্যকে যখন বলতে শুনি, দেখো ছেলেটা খুব স্মার্ট, তখন অবাক হই। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে স্মার্ট বলেছে এ কথা ভুলেও কোনোদিন শুনিনি।

আজকালকার দিনে ছেলে আনস্মার্ট অথবা বোকা এমন অপবাদ কোনো বাবা মায়ের জন্য সুখকর ব্যাপার নয়। এখন চলতে হয় গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একটু এদিক-সেদিন হলেই হোচট খেতে হয়। অন্যের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠতে হয়। আমি প্রায় সকল সময় অন্যের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠি। এ নিয়ে আমার নিজের যতো না দুঃখ তারচেয়ে বেশি দুঃখ আমার বাবা মায়ের। তারা আমাকে নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত। নেহায়েত নিজের সন্তান বলে ফেলে দিতে পারছেন না। না হলে জানি কবেই সুরমার জলে ভাসিয়ে দিতেন।

প্রায় সময় আমি তাদের উপদেশের ভেতর থাকি। কোথাও যাবার আগে, কারো সঙ্গে দেখা করার আগে হাজারটা টিপস শিখিয়ে দেয়া হয়। দাত কেলিয়ে হাসা চলবে না। অল্প কথা বলতে হবে। চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

কিছুতেই আর কিছু হয় না। আমি আমার মতোই থাকি। আত্মীয়স্বজনেরা গল্পের এক পর্যায়ে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। আড়ালে ফিশফিশ করে কথা বলে। মুখ টিপে হাসে। কেউ কেউ আবার উপহাসের স্বরে বলে, *হ্যালো মিস্টার বুদ্ধিমান।*

কিন্তু আমার মনে হয়, আমি এতোটা বোকা নই। এই কথাটা কাউকে বলা যায় না, প্রমাণ দেয়ারও জো পাই না। মাঝে মধ্যে মনে হয় এমন একটা কিছু করি যাতে সবাই অন্তত বলে, আরে, ছেলেটা তো এতো বোকা নয়!

এ রকম একটা মরিয়া ভাব থেকে আমার ভেতরে চাকরি করার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা ভালো কাজ জুটিয়ে নেবো এই ভেবে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য দরখাস্ত দিই। আমার পড়ালেখা নেহায়েত কম না, অন্তত চাকরির দরখাস্ত করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা আমার আছে। এই চেষ্টার কথা কাউকে বলি না, এমনকি বাবা মাকে পর্যন্ত না।

তবুও ব্যাপারটা একদিন বাবার জানা হয়ে যায়। তিনি এটাকে আমার নতুন ধরনের কোনো বোকামি বলে মনে করেন। সমাজে তার একটা ভালো অবস্থান আছে। আমি যেখানে-সেখানে দরখাস্ত করলে তার সম্মানহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাই একদিন আমার জন্য তিনি একটা মোটামুটি মানের অফিসের চাকরির ইন্টারভিউ কার্ড নিয়ে আসেন। এখানে আমার চাকরি হয়ে যাবার যথেষ্ট নিশ্চয়তা। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে তার চূড়ান্ত আলাপ হয়েছে।

ইন্টাভিউ কার্ড আমার হাতে দিয়ে তিনি চিরায়ত উপদেশ বাণী শোনান। ইন্টারভিউ বোর্ডে খুব একটা বেশি কিছু বলার দরকার নেই। যা বলার তা তিনিই বলে এসেছেন। আমি শুধু উপস্থিত হলেই চলবে।

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না। এখানে নিজেকে জাহির করার উপায় নেই। নাটক তৈরি, আমি কেবল অভিনয় করে যাবো মাত্র। তাও শান্তি নেই।

কিভাবে আমাকে ইন্টারভিউয়ের দিনে স্মার্ট করে তোলা যায় তা নিয়ে বাবা মায়ের বিস্তর মেধা ক্ষয়। বাবার ধারণা, চশমা পরে চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য আনা যায়। তাই তিনি আমার জন্য সোনালি ফ্রেমের জিরো পাওয়ার একটা চশমা কিনে নিয়ে আসেন। চমৎকার একটি চশমা।

সেই চশমা পরে ইন্টারভিউ দিতে যাই। নিজেকে আরো বেশি বোকা বলে মনে হয়। বাবা আমার সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। অনেক কসরতে তাকে নিবৃত্ত করি।

আমার পরনে সোনালি ফ্রেমের জিরো পাওয়ার চশমা ইন্টারভিউ রুমে অনেক চাকরি প্রার্থীর আনা–গোনা। একটা মাত্র পোস্ট। তাও সেটা আমার হয়ে যাবার কথা। আমি সেটা জানি। ইন্টারভিউ দিতে আসা অন্য কেউ তা জানে না। সেই অর্থে তারা আমার চেয়ে অধিক বোকা অথবা ওদের বাবা বোকা।

একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মেয়েটার নাম শোভা। সেও ইন্টারভিউ দাতা। কথায় কথায় তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। সেই সূত্রে অল্প সময়ে ভালো ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠ কাউকে খুব গোপন কথা বলা যায়। মেয়েটাকে বলি, এখানে আমার চাকরি হয়ে যাবার শতকরা একশ ভাগ গোপন সম্ভাবনা।

এ কথা শুনে শোভা নামের মেয়েটা ক্ষেপে যায়। বলে, তাহলে এই নাটকের কি প্রয়োজন! আমি অনেক কষ্ট করে এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। কাল সারা রাত জেগে থেকে কারেন্ট নিউজ বইয়ের পাতা মুখস্থ করেছি। আমি জানি হিরোশিমার নাগাসাকিতে কেন বোমা পড়েছিল। আমি জানি বিদ্যুৎ কার আবিষ্কার, কলম্বাস কোন উপায়ে আমেরিকা গিয়ে পৌছেছেন, কবে কোন তারিখে কোথায় কি ঘটেছিল। এতো জেনে শেষ পর্যন্ত কি লাভ? আমার অভাব আমাকে এখানে ইন্টারভিউ দিতে আসতে বাধ্য করেছে। তবুও আমার চাকরি হবে না। এখানে আমার যোগ্যতার দাম নেই। কারণ আপনার মতো আমার একজন বাবা নেই। এতো সব ভণ্ডামির মানে কি, কেন এই নিষ্ফল আয়োজন, কেন এমন ছিনিমিনি খেলা?

তেড়ে আসা এতো সব প্রশ্নে হতবাক হয়ে পড়ি আমার একটা নির্দোষ সত্য স্বীকার এতো সব প্রশ্নের জন্ম দেবে জানা ছিল না। মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে উত্তর শুনবে বলে। আমার সোনালি ফ্রেমের জিরো পাওয়ার চশমা ভেদ করে যেন আমার বোকা সত্তা ঠিকরে বের হয়ে আসতে চায়।

আমি ঠায় বসে থাকি।

ইন্টারভিউ রুমের পিওন এর মাঝে বারকয়েক আমার নাম উচ্চারণ করে নিয়েছে।

জবাব দিইনি।

অন্য কেউ একজন জানিয়ে দেয় অনুপস্থিত।

মেয়েটা আমার নাম এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেনি। না হলে জানতো এখানে থেকেও আমি নেই হয়তো বা বোকারা থেকেও থাকে না অথবা বুদ্ধিমানেরা অনেক স্থানে থাকতে চায় না। আমি কি, বোকা – না বুদ্ধিমান?

আমি উঠে দাড়াই।

মেয়েটা এবার জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছেন?

সত্যি কথাটাই বলি। চলে যাচ্ছি। আমার এখনো অনেক জানার বাকি।

মেয়েটা পেছন থেকে হঠাৎ ডাক দেয়, শুনুন আপনারা চশমাটা ফেলে যাচ্ছেন।

ওটা আমি ইচ্ছে করেই রেখে যাচ্ছি।

ঈশ্বর আমাকে যে জিনিসটার কমতি দিয়েছেন সেটার অভাব অন্য কিছুতে ঢাকতে আর মন মানে না। তাই মেয়েটার পিছু ডাক শুনেও শুনি না। আমার বোকা সত্য নিয়ে সোনালি ফ্রেমের ভণ্ডামি একজন নারীর কাছে জমা রেখে আসি, এতেই আমার সুখ।

সিলেট থেকে

প্রিয় শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

– আশরাফুল ইসলাম

রক্ষণশীল পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে আমার ভাইবোনদের শৈশবে বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। রেডিওর ব্যবহার ছিল কোরাআন তেলওয়াত, আজান ও সর্বোচ্চ খবর শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ক্লাস থৃ-তে পড়ার সময় লক্ষ্য করলাম, আমার বড় বোনেরা প্রতি বিকেলে কি নিয়ে যেন আলাপ করেন। সঙ্গে যোগ হতেন চাচাতো বোন ও তাদের সমবয়সী এলাকার অন্যরা। একদিন সেজআপাকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা কি নিয়ে এতো কথা বলেন।

তিনি বললেন, এটা বোঝানো যাবে না। *শাপমোচন* যে না পড়েছে তার জীবনই বৃথা।

কথাটা আমার ছোট মনে আঘাত করলো। লুকিয়ে আপার টেবিল থেকে শাপমোচন বই এনে কয়েকদিনেই পড়ে ফেললাম। এবং তারা বিকেলে যেসব আলাপ করে তাও ফলো করা শুরু করলাম। তাদের আলোচনা আমাকে আরো বই পড়তে আগ্রহী করে তুললো। এভাবে *চিতা বহ্নিমান, রিক্তের বেদন, গোধূলিয়া* তাদের অজান্তেই পড়ে ফেললাম।

কিছু দিন পর লক্ষ্য করলাম, আলোচনার বিষয়বস্তু প্রসারিত হয়েছে। গান এবং সেসবের মানে নিয়েও তারা আলোচনা করেন। একটু একটু করে গান শোনাও শুরু হলো। গান শোনা হয় একেবারে চোখ বন্ধ করে, পিনপতন নিস্তব্ধতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা আর ইবাদত করা যেন সমান।

তাদের এই গান শোনা আমাকেও প্রচণ্ড আকর্ষণ করলো। আমিও বিকেল এবং রাতের আসরের একজন শ্রোতা হয়ে উঠলাম। *গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, জেনেশুনে বিষ করেছি পান* গানগুলো আমাকেও আকর্ষণ করলো।

এর মধ্যে বড় ভাই বিদেশ থেকে টেপ রেকর্ডার পাঠালেন একটি ক্যাসেটসহ। ক্যাসেটে গান শুনে মনে হলো, এ গানই যেন আমার প্রাণ। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর *আমার সকল দুঃখের প্রদীপ।*

সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা ও চর্চা যেন জীবনের অংশ হয়েই জড়িয়ে রইলো।

একদিন নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে ক্যাসেট শুনছি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যখন *ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না* শুনলাম চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়লো। কে যেন বলেছিল কণিকা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার মানে তাকে এই গান, সুর রেখে চলে চলে যেতে হবে। তাই তার এ গানে যেন আমাকেই সঙ্গে যেতে ডাকছে। আমি যেন আখি ফিরায়ে বলি না না।

কিছু দিন পর পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে আসছেন। আমি পাগল হয়ে ছুটে গেলাম আমার প্রিয় শিল্পীকে প্রণাম করবো বলে। জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে ঢুকতে গিয়েই জানলাম আমন্ত্রণপত্র দেখাতে হবে। মুহূর্তেই যেন আমার আবেগ এবং স্বপ্ন ভেঙে যেতে লাগলো। দৌড়ে পিজি হসপিটালের নিচে গিয়ে বন্ধু চঞ্চল সাহা অপুকে ফোন করলাম। কিছু দিন আগে সে শান্তিনিকেতনে শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অটোগ্রাফসহ ৩৭ সাইজের ছবি নিয়ে এসেছে। এটা অনুষ্ঠানের পাস হিসেবেও কাজ করবে।

অপু আগেই বেরিয়ে গেছে।

কি করি? আবার দৌড়ে গেলাম জাদুঘর মিলনায়তন মুখে। রাস্তায় দেখি এক ভদ্রলোক দুটি কার্ড নিয়ে অনুষ্ঠানে ঢুকছেন। এক্সকিউজ মি বলে জানতে চাইলাম তিনি কিভাবে কার্ড পেলেন।

আমি পিডাবলিউডি-র ইঞ্জিনিয়ার। আমন্ত্রিত শ্রোতা হিসেবে আমি ও আমার স্ত্রী দুইটা কার্ড পেয়েছি। তিনি জানালেন।

দেখুন, আমি তার খুবই ভক্ত। আপনি যদি আমাকে অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ হবো। বিনিময়ে টাকা চাইলে তাও দিতে রাজি।

শুনে তার বোধহয় দয়া হলো। তিনি নিজের নামের একটি কার্ডটি আমাকে দিলেন। নিজে (আহমেদ মূর্তজা কবীর মুরাদ) অন্য কার্ডটি নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

মিলনায়তনে ঢুকে চোখ বোলাচ্ছি কোনো আসন খালি আছে কি না। এমন সময়ে কানে ভেসে এলো তানপুরার সঙ্গে অপূর্ব ভোকাল – *দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের পরে।* এই গান যেন শুধু আমারই জন্য।

কোনো আসন খালি না পেয়ে আসা–যাওয়ার মাঝের রাস্তায় অর্থাৎ স্টেজের একেবারে সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। গানের তালে শরীর হেলে পড়ছে পেছনে বসা ভদ্রলোকের ওপর। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চাওয়ামাত্রই দুজনেই অবাক। অপু! কণিকা ভক্ত। সবার আগেই আসন দখল করেছে। এই ফাকে এক টিভি অভিনেত্রী উঠে গেলে অপুর পাশে গিয়ে বসলাম।

একি কণিকা তার ডায়রি এতো কাছে ধরেছেন কেন? তিনি কি চোখে দেখেন না। পরক্ষণেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তার চোখের সমস্যা। তার চোখে একটি চশমা এবং গলায় পর পর আরো তিনটি চশমা ঝোলানো আছে। ডায়রি উল্টানোর ফাকে ফাকে তিনি চশমা মুছে একেক সময় একেকটা পরছেন। মাঝখানে কথা বলার সময় আরেকটা পাল্টালেন।

কণিকা সুরের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছেন সবখানে। সুরের এই ধারায় যোগ দিয়েছেন বন্যা, পাপিয়া, শামা, সাদি ও গোরা চক্রবর্তী। বন্যা আয়...না, আমার কাছে আয় বলে গানের বিরতিতে এমনভাবে হাত নেড়ে খুজলেন যেমনটা অন্ধ মানুষ খোজে। এতো কষ্ট কেন তার। এতোগুলো চশমা থাকতেও এভাবে খুজতে হয়! আমি এসবই খুটিনাটি সব দেখছি আমার গানের জাদুকরীকে।

গান শেষে পুষ্পস্তবক দেয়া হলো শিল্পীকে। তারপর কণিকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে দ্রুত প্রণাম করলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে কণিকা দূরের জিনিস দেখার চমশাটা পাল্টিয়ে সাধারণ চশমা চোখে দিয়েছেন। এ কারণে আমার প্রণাম তিনি নিতে পারেননি।

পরক্ষণেই ভাবলাম হাত ছুয়ে আমার শ্রদ্ধা জানাবো।

সেই মুহূর্তেই লিফট দ্রুত নেমে গেল।

এতো কাছে এসেও শিল্পীকে প্রণাম করতে না পারার দুঃখ রয়েই গেল আমার।

১৯৯৯–এর অক্টোবরে কলকাতা গেলাম কণিকাকে প্রণাম করবো বলে। কিন্তু অনেক কষ্ট করে, বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে বন্ধু শাহীন ইকবাল জানালো, কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন যেতে বারো ঘণ্টা লাগবে। তাও আবার রাস্তায় পানি, খুবই কষ্টকর।

যাওয়া হলো না আর শান্তিনিকেতন। দুই বছর আগে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু তার সুরের জাদুতে তিনি যেন এখনো আমায় বলেন –

আমি যত বলি তবে
এবার যে যেতে হবে
দুয়ারে দাড়ায়ে বলে না না...।

দমদমা, সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ থেকে

গচ্চা

– এ.আর.এস রেজা

ছোটবেলায় একটি নীল রঙের প্লাস্টিকের চশমা ছিল আমার। বায়না ধরে কান্নাকাটির পর মা কিনে দিয়েছিলেন এক টাকা দিয়ে। ওটা পেয়ে সেদিন কি যে খুশি হয়েছিলাম তা আর বলে বোঝাতে পারবো না। ওটাই আমার জীবনের প্রথম চশমা ছিল।

এরপর চশমা নিয়ে ছোটখাটো অনেক ঘটনাই ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। জীবনের শত কর্মব্যস্ততার মাঝে এসব ঘটনাগুলো আলোচনায় যদিও না আসে তবুও হৃদয় থেকে একেবারে মুছে যায় না। যেমন মুছে যায়নি আমার বাবার মৃত্যু স্মৃতি। হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে নিয়ে যাবার পর বাবার শেষ কথাটি ছিল, আমার চশমা দাও।

এর ঠিক তিন মিনিট পর বাবাকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। সেদিনের সে অবস্থার কথা মনে হলে আজও দম বন্ধ হয়ে কান্না আসে। বাবা তার চশমা দিয়ে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে পৃথিবীকে শেষবারের মতো দেখতে পারেননি। আমার বাবার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে চশমাটিও যত্নে রাখা হয়েছে।

বাবার মৃত্যুর কয়েক বছর পর সউদি আরব চলে আসি। প্রথমে বেতন কম ছিল। তিন মাস ট্রেনিং অবস্থায় ছিলাম। সউদি তথা মধ্যপ্রাচ্যের গরম সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানে। এখানে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস–এর উপর তাপমাত্রা উঠে আসে জুন–জুলাইতে। এতো রোদ এবং গরমের মধ্যে বাইরে বের হওয়া খুব কষ্ট। তার উপর সানগ্লাস না থাকলে কষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায়। অনেকে দশ রিয়াল দিয়েও সানগ্লাস কিনে ব্যবহার করে।

নতুন অবস্থায় বেতন কম। তাই এক রিয়াল খরচ করতে হলেও খুব হিসাব করে খরচ করতাম। আমার ট্রেনিং শেষ হতে হতে শীতকাল এসে পড়লো। তাই আর সানগ্লাসও কেনার প্রয়োজন বোধ করিনি।

পরের বছর ১৯৯৯ সাল। এপ্রিল মাসের বেতন পেয়ে চারশ রিয়াল হাতে রেখে বাকি টাকা মাকে পাঠিয়ে দিয়ে বিকেলে চলে গেলাম একটি অভিজাত সানগ্লাসের দোকানে। কাচের শেলফ চতুর্দিকে। ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে সানগ্লাস। কোথাও Carrera, কোথাও Diesel, কোথাও Police লেখা আছে। আমি জানি এগুলো দামি সানগ্লাস। আমার বাজেট যেহেতু একশ রিয়ালের উপর নয়, তাই ওদিকে না গিয়ে অন্যদিকটায় গেলাম। উদ্দেশ্য, কম দামি সানগ্লাস কিনবো।

এক জায়গায় লেখা দেখলাম Ray-Ban. ভাবলাম কম দামি হবে। এর আগে এ নাম শুনিনি। এগুলোর দাম যে আরো বেশি তা জানা ছিল না। খুজতে খুজতে নিরানব্বই মডেলের ফ্রেম ছাড়া গ্রে কালারের একটি সানগ্লাস পছন্দ করি। এখানে উল্লেখ্য যে, দোকানে আরো দুই একজন ক্রেতা আছে এবং এক ইজিপশিয়ান দম্পতি তাদের কেবল হাটতে শেখা বাচ্চাকে দোকানের ভেতর ছেড়ে দিয়েছে। তারা দুজনই সানগ্লাস দেখতে ব্যস্ত। বাচ্চাটি কখন আমার কাছে এসেছে টের পাইনি। সানগ্লাসটি হাতে নিয়ে সেলসম্যানকে দাম জিজ্ঞাসা করার জন্য পেছন দিকে ঘোরার সময় বাচ্চাটা ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেছে এবং আমার পা যেখানে পড়ে সেখানে বাচ্চার কচি পা। আমার পায়ে ভারী ক্যাট বুট। বাচ্চাটাকে বাচাতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে ডান হাত দিয়ে মেঝেতে সেল্টার নিই এবং সঙ্গে সঙ্গে সানগ্লাসটা ভেঙে কাচ হাতের তালুতে খানিকটা ঢুকে পড়ে।

সম্পূর্ণ ঘটনাটি মাত্র দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যায়। বাচ্চাটি একটি মাত্র চিৎকার দিয়ে থেমে গিয়েছে। আমার হাতে রক্ত ঝরছে। বাচ্চাটিকে তার মা কোলে তুলে নিল।

সেলসম্যান এসে আমার হাত টিসু দিয়ে মুছে স্প্রে করে দিল।

ইজিপশিয়ান দম্পতি আমার প্রতি এমন ভাব দেখালো যেন আমি মহা ভুল করে ফেলেছি।

যাহোক, কতোক্ষণ দোকানের সোফায় বসে রইলাম।

ইজিপশিয়ান দম্পতি চলে গেল।

এরপর সেলসম্যান জানতে চাইলো আমি আরেকটি সানগ্লাস চাই কি না।

তখন জানতে চাইলাম ভাঙা সানগ্লাসটির দাম কতো।

সে বললো, দুটো সাতশ চল্লিশ রিয়াল। মানে ভাঙাটার দামও যে আমাকে দিতে হবে তাই বোঝানো হলো। ভাঙাটার দাম তিনশ সত্তর রিয়াল দিতে হবে। তারপর ওই রকম আরো একটা চাইলে সাতশ চল্লিশ রিয়াল।

দুইটা দূরে থাক, একটির দাম দিতে গেলেই তো আমার মানিব্যাগ শুকিয়ে যাবে। সারা মাস চলবো কি করে? এ চিন্তায় হাতের ব্যথা অনুভব করি না। শেষ পর্যন্ত তাকে অনুরোধ করলাম দাম কিছু কমানোর জন্য। যেহেতু গ্লাসটি আমার কোনো কাজে আসবে না, তাই অন্তত কিছু পয়সা তুমি কম রাখো।

সে জানালো, কোড নাম্বারে যে দাম আছে তার চেয়ে একটি রিয়ালও যদি সে কমায় তাহলে তার বেতন হতে কেটে নেবে কম্পানি।

অগত্যা তিনশ সত্তর রিয়ালই আমাকে দাম পরিশোধ করতে হলো এবং এ জন্য আমাকে ওই মাসে ঋণ করতে হয়েছিল।

এর দুই মাস পরে ওই মডেলের Ray-Ban কিনেছি। এখানো প্রতি বছর নতুন মডেলের Ray-Ban কিনি। কিন্তু সেদিন ভাঙা চশমার দাম পরিশোধ করতে তিনশ সত্তর রিয়াল বা পাচ ছয় হাজার টাকা গচ্চা দিতে হলো। তবুও কষ্টটা ভুলতে পারি যখন মনে হয় নরম তুলতুলে বাচ্চাটাকে ব্যথা পেতে দিইনি।

সউদি আরব থেকে

চোখের বালি

– নাদিরা দিল বারী

চশমা পরার সাধ আমার অনেক দিনের। কিন্তু চোখ জোড়া বেজায় রকমের ভালো। তাই চশমাটা আর চোখে উঠে আসতে পারছিল না। স্কুলে পড়ার সময় থেকে শুরু করে কলেজ, এমনকি ইউনিভার্সিটি পর্যন্তও ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু বলতাম চশমা নেয়ার জন্য। কিন্তু ডাক্তার বাবাজি নাছোড়বান্দা। চশমা আমাকে নিতেই দেবেন না!

শেষমেষ ডাক্তার বদলালাম। দেখি, এই বাবাজি কি বলেন! কিন্তু কোনো ফল হলো না। এও একই গোয়ালের গরু। চশমা তোমাকে দেয়া হবে না। এ পণটা বুঝিবা ডাক্তাররা আগেভাগেই করে রেখেছেন।

একদিন বিয়ে হয়ে গেল। গেলাম শ্বশুরবাড়ি। বাচ্চা হলো। ভাবলাম, এবার বুঝি চশমা চোখে উঠবে। কেননা একটু হলেও তো আমার চোখের জ্যোতি বাচ্চার চোখের জ্যোতি গড়তে সাহায্য করেছে। কিন্তু এ কি যন্ত্রণা। চোখ যে আর নষ্ট হয় না। চশমাও জুটছে না ভাগ্যে। একি দুর্দশা রে বাবা!

কিন্তু বিধাতা বোধহয় আমার মনের কথা এতোদিনে বুঝতে পারলো। কিছু দিন পর পরই মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হলো। এদিকে টিভি দেখার সময় দেখলাম, কিছু কিছু জিনিস ঘোলাটে দেখাচ্ছে। ভাবলাম, এটা আমার মনের অসুখও হতে পারে। নিজের ওপরই আমি বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম। হঠাৎ একটা কথা ঝিলিক মেরে উঠলো, আরে, আমার চোখ খারাপ হয়নি তো! ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। যা ভেবেছিলাম, অবশেষে তা ফলতে চলেছে।

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে বললেন, চশমা এবার লাগবেই।

আমি তো খুশিতে ডগমগ।

এবার ডাক্তারের কড়া নির্দেশ এলো, সব সময় চশমা চোখে দেয়ার অভ্যাস করতে হবে। না হলে খুবই খারাপ হবে।

দিন যায়। চশমা চোখে দিয়ে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কই, চশমার জন্য আগে যে উত্তেজনা ও শখ ছিল তা যে আর খুজেই পাচ্ছি না। বরং একরাশ বিরক্তি এসে ভর করেছে চশমা চোখে রাখতে রাখতে। কেন যে সেধে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।
আজ গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবি আর হাহুতাশ করি। হায়রে চশমা! এতো প্রিয় ছিলি যার কাছে তুই, এখন তুই-ই হয়েছিস আমার চোখের বালি!

উত্তরা, ঢাকা থেকে

স্পর্ধা

– রাশেদুল হাসান রাসেল

বামা, মা, ভাইয়া আর আমি, পরিবারের সদস্য সাকূল্য আমরা এই চারজন। দাদা-দাদি মারা গেছেন বেশ আগেই। আর দাদার এক সন্তান হওয়ায় বাবার কোনো ভাইবোনও ছিলেন না। এ কারণে আমাদের কাছের আত্মীয়ও তেমন ছিল না। বাবা ছিলেন সরকারি কেরানি। পৈতৃক সূত্রে বিষয় সম্পত্তি তেমন না পেলেও একটা জিনিস বাবা ভালোমতোই পেয়েছিলেন। সেটা হলো সততা। আর সরকারি কর্মচারীদের সততা রোগ থাকলে যা হয়, সেই আর্থিক অনটন লেগেছিল বছর জুড়েই।
বাবাকে দেখেছি এক প্যান্ট আর দুটি মাত্র শার্ট পরে বছরের পর বছর অফিস করতে। নিতান্ত প্রয়োজনের বাইরে তাকে কোনো শখ মেটাতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমাদের তিনি সুখে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।
আমরাও কেমন করে যেন প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারতাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শ ছেলেদের মতো আমাদের দুই ভাইয়েরও চাওয়ার গণ্ডি ছিল সীমিত। তখন থেকেই আমরা বুঝতে শিখেছিলাম, আমাদের আশার সীমানা আকাশ ছুলেও বাবার দিতে পারার ক্ষেত্র খুব একটা বড় নয়। আমি মাঝে মধ্যে দুই একটা সাহসী আবদার করলেও ভাইয়াকে কখনো তেমনটি করতে দেখিনি।
আমার এমন ভাইয়ার মধ্যেও একটা ঘোড়া রোগ গজিয়ে উঠেছিল। সেটা হলো সানগ্লাস। কলেজে ওঠার পর ভাইয়াকে দেখতাম প্রায়ই বন্ধুদের সানগ্লাস ব্যবহার করতেন। যে কোনো অনুষ্ঠানে বাইরে বের হলেই ভাইয়া কারো না কারো কাছ থেকে একটা সানগ্লাস জোগাড় করে আনবেনই। প্রায়ই হয়তো দেখা যেতো বাবা বা অন্য কোনো মুরুব্বির সামনে থাকায় পরার সুযোগ পেতেন না, তবু পকেটে ঠিকই থাকতো। এ ভাইয়াই একদিন দুঃসাহসী হয়ে নিম্ন আদালতে অর্থাৎ মায়ের কাছে একটা সানগ্লাসের আবেদন করে ফেললেন।
কিন্তু কোনো রকম শুনানি ছাড়াই মা সেই মামলা খারিজ করে দিলেন। আর এ ধরনের আবদার ভবিষ্যতে যাতে কোর্টে না ওঠে সে জন্যও ভাইয়াকে সতর্ক করে দেয়া হলো।
এরপর সানগ্লাসের ব্যাপারে ভাইয়া আর উচ্চবাচ্চ করেননি।
একদিন সবাই মিলে যখন রোজার ঈদের কেনাকাটার জন্য মার্কেটে গিয়েছি। বছর দশেক আগের কথা, ভাইয়া তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়েন। সবার কেনাকাটা শেষে আব্বা একটা চশমার দোকানে ঢুকলেন। তার পুরনো চশমাতে আর কাজ চলছিল না। তাই ডাক্তারের পরামর্শে নতুন চশমা নিতে হবে।
চশমার দোকানে ঢুকে আব্বা যখন চশমা দেখছেন তখন হঠাৎ ভাইয়ার মাথায় কি হলো জানি না, নিম্ন আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সানগ্লাসের কথা সরাসরি হাই কোর্টে উপস্থাপন করলেন।
হাই কোর্টের বিচারক অর্থাৎ আব্বাও হঠাৎ করে দিশেহারা হয়েই কি না, আবেদন মঞ্জুরও করে ফেললেন। পুরো ঘটনায় আমি আর মা হতবাক।
তারপর ভাইয়া অনেক খুজে যে সানগ্লাসটি পছন্দ করলে সেটা সম্ভবত Police ব্র্যান্ডের।

তার দাম শুনে আমাদের আক্কেল গুড়ুম। বাবার সারা মাসের বেতন দিয়েও সানগ্লাসটির দাম হবে না।

আব্বা তখন অন্য একটি সানগ্লাস নেয়ার কথা বললে, মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের কারণেই কি না, ভাইয়া বললেন, সানগ্লাসই কিনবেন না।

বাবা-মায়ের পীড়াপীড়িতেও ভাইয়া যখন রাজি হচ্ছিল না, অক্ষমতার ক্ষোভের জন্যই বোধ হয় বাবা যে কাজটি করলেন তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। শ শ লোকের সামনে বাবা জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো ভাইয়ার গালে চড় লাগিয়ে দিলেন।

লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে ভাইয়া তখন চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না।

সেই ঈদটা ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে নিরানন্দ ঈদ।

সেদিন আব্বা তার চশমা না কিনেই চলে এলেন।

সেই ঈদে আমরা কেউ নতুন কাপড় পরলাম না। সেই ঈদে আমরা কেউ নানুবাড়িতে গেলাম না, এমনকি যেটা আর কখনো করিনি, ঈদে আমরা কেউ দাদা-দাদির কবর জিয়ারত করতেও গেলাম না।

সেই ঘটনার পর থেকে আব্বাকে আর চশমা পরতে দেখিনি। আমার দরিদ্র বাবা ছেলেকে সানগ্লাস কিনে দিতে না পারার যন্ত্রণা ভুলেছেন নিজের চোখকে শাস্তি দিয়ে। ফলে বাবা প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়াকেও আর কোনোদিন সানগ্লাসের কথা বলতে শুনিনি। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে যে সানগ্লাস পরতো সে রকমও দেখিনি কোনোদিন।

সময়ের পরিক্রমায় ভাইয়া এখন অনেক পরিণত। এখন ভাইয়া মাসে বেতনই পান লাখ টাকা। ইচ্ছা করলেই ভাইয়া এখন পৃথিবীর যে কোনো ব্র্যান্ডের চশমা যখন খুশি কিনতে পারেন। কিন্তু কাঠফাটা রোদ বা চরম প্রয়োজনেও তাকে আর কখনোই সানগ্লাস ব্যবহার করতে দেখিনি।

তার ভাষায়, আমার যে সৎ, দরিদ্র বাবা বেচে থাকতে তার সব সামর্থ এক করেও ছেলেকে তার পছন্দের জিনিসটা কিনে দিতে পারেননি, তার মৃত্যুর পর সেই জিনিসটি ব্যবহার করে তার অক্ষমতাকে, তার ভালোবাসাকে, তার আত্মাকে অপমান করার স্পর্ধা আমার নেই।

প্রায় অন্ধ অবস্থায় বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় পাচ বছর হলো।

ওসমানী মেডিকাল কলেজ, সিলেট থেকে

রোগী ডাক্তার এবং আমি

– এম আনোয়ার হোসেন

আমাদের পরিবারে সাত বোন এবং পাচ ভাই। বাবা-মাসহ চশমা ব্যবহার করেন মাত্র তিনজন। চশমা তো ব্যবহার প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ে। তারপরও কোনো ব্যক্তির চোখের সমস্যার কারণে চশমা ব্যবহার করতে দেন ডাক্তার।

ডাক্তার-রোগী পরস্পর একটা ভালো সম্পর্ক থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে রোগীদেরকে রোগী হিসেবে ডাক্তার মূল্যায়ন করেন না, টাকার অংকে মূল্যায়ন করেন। তেমনি একটা ঘটনা বর্ণনা দিচ্ছি।

মা চোখে চশমা ব্যববহার করেন আজ প্রায় বিশ বছর। হঠাৎ করে চোখে ছানি পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। একজন আই স্পেশাল কনসালটেন্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

তিনি প্রথমে মায়ের চোখ না দেখে আমাদের বায়োডাটা নিয়ে নিলেন। তারপর মায়ের চোখ দেখলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললেন, আপনার মায়ের চোখে ছানি পড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করা দরকার। আগামী শুক্রবার আমার প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে আসবেন।

বললাম, মায়ের চোখে ছানি তো এখনো এডাল্ট হয়নি, আপনি কি বলেন? সেই দিন অন্য ডাক্তার বললেন, চোখের ছানি অপারেশন এখনো ছয় মাস বাকি। আপনি বললেন আগামী শুক্রবারের মধ্যে ছানি অপারেশন করতে হবে।

আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, ডাক্তার আপনি, না আমি।

তখন আমি নিরুত্তর।

তখন আমাকে বললেন, ঠিক আছে, চোখের চশমার পাওয়ার বদল করে দিচ্ছি।

তখন কি আর করা! খালি চোখে থাকা নিরাপদ নয় বলেই নতুন চশমা নিতে হলো।

আমার প্রশ্ন হলো, যে ডাক্তার বললেন ছানি তখনো এডাল্ট হয়নি, ছয় মাস লাগবে আর এখন এই ডাক্তার বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ক্লিনিকে আসেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের ডাক্তারের যা অবস্থা তাতে সাধারণ রোগীদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। ডাক্তাররা রোগ দেখে নয়, রোগীর অবস্থা দেখে চিকিৎসা করেন। ক্লিনিকে নিয়ে রোগীদের ওপর বেশি টাকা ধার্য করেন। এক্ষেত্রে সাধারণ রোগীরা টাকার অভাবে ক্লিনিকে যেতেই পারেন না। আমি শুধু একটি ঘটনাই তুলে ধরলাম।

ভোলা থেকে

দায়মুক্ত

– হাসান মীর

চশমা নিয়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের স্মৃতি কথা লিখতে বসে এক ধরনের অপরাধ বোধ আমাকে বিব্রত করছে। লিখবো কি লিখবো না এ কথা ভাবতে হচ্ছে বার বার।

আমি ১৯৫৬ সালে কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র। আব্বার চাকরির সুবাদে থাকি পোড়াদহ–এ। পোড়াদহে তখন হাই স্কুল ছিল না। ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসেবে স্কুলে যেতাম। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সুবাদে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর রেলগেটের কাছে প্রয়াত সাব রেজিস্টার শেখ ইউসুফ আলীর বাড়িটি ছিল আমার অস্থায়ী আস্তানা। কখনো স্কুলের ছুটির পর কিংবা কোনোদিন অসময়ে ছুটি হয়ে গেলে ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতাম।

বাড়ির বড় ছেলে আগা ইউসুফ, প্রয়াত শিল্পপতি তখন পাকিস্তান আর্মির অফিসার। বাড়িতে থাকতেন আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় হাসান ইউসুফ আর ছোটটি আনোয়ার ইউসুফ এরাও দুজন পরলোকের যাত্রী হয়েছেন। এদের মাকে ডাকতাম বড়মা বলে। সময়–অসময়ে যখনই ওই বাড়িতে যেতাম, বড়মা কিছু না কিছু খেতে দিতেন। অনেক দিন রান্নাঘরের মেঝেতেই পিড়ে পেতে ভাত–তরকারি যা আছে থালায় বেড়ে দিয়েছেন।

একদিন বাসা থেকে রেল স্টেশনের ওভারবৃজের নিচ দিয়ে বাজারে যাচ্ছি। বৃজের নিচে এক কোণে বসে আছেন জটাধারী এক সাধু বাবা। আমাকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি তার সামনে যেতেই মাটিতে বসতে ইঙ্গিত করলেন এবং আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে জ্যোতিষীদের মতো হাতের রেখা পরীক্ষা করে বললেন, তোর ভাগ্য খুব ভালো। মন দিয়ে লেখাপড়া করবি এবং একটা সবুজ কাচের চশমা পরিস। দে, আট আনা পয়সা দে।

বাজারের পয়সা থেকে সাধুবাবার হাতে একটা আধুলি দিয়ে খুশি মনে উঠে এলাম। কিন্তু সমস্যা হলো সবুজ চশমা নিয়ে। আমরা অনেকগুলো ভাই–বোন। আব্বার সীমিত আয়ের টানাটানির সংসার। তার মধ্যে এক জোড়া শখের চশমা কেনার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ সাধুবাবার উপেদশও ভুলতে পারি না। আমাকে যে করেই হোক সবুজ কাচের চশমা পরতেই হবে!

একদিন অভ্যাসবশত সাব রেজিস্ট্রারের বাড়িতে গেছি। ছেলেরা কেউ বাড়িতে নেই। মানুনানার (হাসান ইউসুফের ডাক নাম) পড়ার টেবিলে একটা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ টেবিলের কোণে কাচ বিহীন প্লাস্টিকের ফ্রেমের একটা চশমা চোখে পড়লো। চশমার ফ্রেমটি সুন্দর। লোভ সামলাতে না পেরে সেটি লুকিয়ে পকেটে তুলে নিলাম এবং কয়েকদিন পর চশমার দোকান থেকে তিন কিংবা পাচ টাকা দিয়ে তার সঙ্গে দুটো সবুজ রঙের কাচ লাগিয়ে নিলাম।

চশমা তো হলো। কিন্তু ওটা রাখি কোথায় এবং চোখেই বা পরি কখন এই নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। বাড়িতে কারো চোখ পড়লে কার চশমা, কোথায় পেলাম এমনি হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আবার আমার মতো স্কুলে পড়ুয়া একটি ছেলের শখ করে রঙিন কাচের চশমা পরতে দেখলে নিতান্তই ফুটানি ছাড়া কেউ অন্য মন্তব্য করবে না। ফলে প্রথম দুই একদিন স্কুলে যাওয়া-আসার পথে চোখে দেয়া ছাড়া ওই চশমা জোড়া আর কোনো কাজে এলো না। এবং একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রেনে ওটা হারিয়ে ফেললাম।

চশমা হারিয়ে সত্যি বলতে কি, আমার কোনো দুঃখ হয়নি, খারাপও লাগেনি। কারণ এর আগে একদিন মি. ইউসুফের বাড়িতে গিয়ে দেখি মানুনানা ওই কাচ ভাঙা চশমার ফ্রেমটি খুজে বেড়াচ্ছেন এবং বাড়ির চাকর ছেলেটির ওপর খুব মেজাজ দেখাচ্ছেন।

বিষয়টি আচ করতে পেরে আর তার সামনে ভিড়লাম না।

আমি সামান্য একটা চশমার ফ্রেম চুরি করেছি এমন চিন্তা হয়তো তার মাথায় আসতো না। তবুও জেরার মুখে পড়তে হয় এবং মিথ্যা বলার ঝুকি নিতে হয় এ আশংকায় বাড়ির উঠান থেকেই কেটে পড়লাম। তবে একই সঙ্গে চশমাটি হারিয়ে যাওয়ায় আমি যে দায়মুক্ত হয়েছি এ কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করলাম।

এরপর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। নতুন চশমা অনেকবারই কেনা হয়েছে এবং এখন তো এ ষাটঊর্ধ বয়সে চশমাই নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সেই সবুজ কাচের চশমার কথা এতো দিনেও ভুলতে পারিনি। তাই অল্প বয়সের অপরাধ বোধের কথাটি সর্বসমক্ষে স্বীকার করে আরো একবার দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম।

রানীবাজার, রাজশাহী থেকে

অদ্ভুত

– শুচি

আমি তখন ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্রী। নতুন চশমা নিয়েছি। চশমা পরে নিজেকে পণ্ডিত ভাবতে খুব ভালো লাগে। মনে হয় সবাই বুঝি বুঝতে পারছে যে, মেয়েটি নিশ্চয় খুব পড়াশোনা করে। তাই পড়াশোনা করতে করতে তার চোখ খারাপ হয়ে গেছে। এ রকমটা ভাবতে খুবই ভালো লাগতো। এছাড়া পড়াশোনার প্রতি যেন তখন আগ্রহও বেড়ে গিয়েছিল।

আমার বয়েসী সবার অর্থাৎ আমার ক্লাসমেটদের প্রায় সবার ধারণা ছিল যে, চশমা দিয়ে সব কিছুই একটু বেশি বেশি দেখা যায়। এ নিয়ে আমাদের বান্ধবীদের মধ্যে বেশ গবেষণাও চলতো। বান্ধবীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তখন চশমাধারী হয়েছি।

একদিন কোচিংয়ে গিয়েছি। সব দিনের মতোই সেদিনও চশমা নিয়ে গল্প শুরু হলো। হঠাৎ বান্ধবীদের মধ্যে যে কেন (নামটা ঠিক মনে পড়ছে না) বললো, জানিস, এখন নাকি নতুন এক ধরনের চশমা বেরিয়েছে যেটা পরলে সব কিছু দেখা যায়। যেমন কোনো মেয়ে বা ছেলে যদি তিন চারটা কাপড়ও পরে থাকে তবুও তার ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই দেখা যাবে। বড়লোকের বখাটে ছেলেরা এবং মাস্তানরা এসব চশমা ব্যবহার করে। কারণ চশমাটার অনেক দাম এবং সব জায়গায় তা কিনতেও পাওয়া যায় না।

এ রকম একটা আজগুবি গল্প শুনে আমরা প্রথমে তো সবাই অবাক। কেউ কেউ বিশ্বাস করলাম আবার কেউ কেউ বললো, যতো সব আজগুবি গল্প! কিন্তু যে বলছিল সে এতো বিশ্বাসযোগ্যভাবে গল্পটা বলেছিল যে, আমরা বেশির ভাগেরাই তার কথা বিশ্বাস করলাম।

কয়েকদিন এই নিয়ে চললো মহা গবেষণা। সত্যিই তো চিন্তার বিষয়। যদি এ রকম একটা অদ্ভুত চশমা আবিষ্কার হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টা কি লজ্জারই না হবে। আমরা তো অনেক ভয়ে লজ্জায় আতংকিত। কেননা কোনো অসভ্য ছেলে যদি এই বাজে চশমাটা দিয়ে আমাদের দেখে ফেলে তাহলে কি লজ্জারই না বিষয় হবে সেটা! আবার চশমাটা নাকি এমন যে, দেখলে বোঝাও যাবে না এই সেই চশমা। অর্থাৎ দশটা সাধারণ চশমার মতোই সেটা।

এই গল্প শোনার পর কিছু দিন আমরা কোনো বখাটে ছেলেকে চশমা বা সানগ্লাস পরা দেখলেই ভেতরে ভেতরে আতংকিত হতাম। এই বুঝি আমার ইজ্জত গেল।

অবশেষে একদিন স্কুলের এক বড় আপুকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হেসে বললেন, আসলে তোমাদের ওই বান্ধবী তোমাদের ভয় দেখিয়েছে। এ রকম কোনো চশমার কথা আমরা তো শুনিনি। যদি থাকতোই তাহলে তা অবশ্যই পেপার বা পত্রিকাতে প্রকাশ পেতো।

তার কথা চিন্তা করে দেখলাম, সত্যিই তো যে, কোনো নতুন কিছু আবিষ্কার হলে পত্রিকাতেই তা আগে আসে। এমন অদ্ভুত এক চশমার খবর পেপারে এলোই না? বুঝতে পারলাম আমাদের বোকা বানানোই ছিল ওই বান্ধবীটির মূল উদ্দেশ্য।

সেসব দিনের কথা মনে হলে এখনো হাসি পায়। কি বোকাই না ছিলাম! তবে সে যাহোক, দিনে দিনে কতো কিছুই তো মানুষ আবিষ্কার করছে। যদি কখনো এমন অদ্ভুত কোনো চশমা আবিষ্কার করেই ফেলে মানুষ তখন বিষয়টা কি লজ্জারই না হবে!

আগারগাও, ঢাকা থেকে

শাস্তি

– তানিয়া বেগম তিন্নি

আমার চাচাতো ভাই হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন কয়েসভাই। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। বাড়িতে হোসেনভাইয়ের কাছে কয়েসভাই এলে কোনো এক রহস্যময় কারণে হোসেনভাইয়ের আম্মার চেয়ে আমার আম্মাকে বেশি সম্মান দেখানোর চেষ্টা করতেন। আমার চাচিকে শুধু চাচি ও আমার আম্মাকে চাচিআম্মা ডাকতেন।

১৯৯৯ সালে হোসেনভাইয়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তাকে তাড়াতাড়ি করে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। সঙ্গে কয়েসভাইও ছিলেন। আমরা যখন হোসেনভাইকে দেখার জন্য হাসপাতালে যেতাম তখন দেখতে পেতাম হোসেনভাইয়ের মাথার পাশে টুলে বসে আছেন কয়েসভাই। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর আমাদের পরিবারের সঙ্গে কয়েসভাইয়ের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লো।

কিছু দিন পর বুঝতে পারলাম, কয়েসভাই আমাকে কিছু একটা বলতে চান। তিনি বোধহয় কিছুটা বোকা। না হলে আমিও যে ওনাকে কিছু একটা বলতে চাই তা তিনি টের পেতেন। বোধহয় তার এই বোকামি দেখে ওনার প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

তিনি যখন চেয়ারে বসতেন, বিদ্যুৎ না থাকলে গরমে ঘেমে যেতেন। সবচেয়ে বেশি ঘামতো ওনার নাক। সে জন্য নাকের ওপর বসানো চশমাটা পিছলে যেতো এবং তিনি রুমাল দিয়ে নাক ও চশমা মুছে আবার বসাতেন। আবারও চশমা পিছলে গেলে তিনি আঙুল দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে তুলতেন।

টিভিতে যদি সুবর্ণা মুস্তাফা, আফজাল হোসেন বা হুমায়ুন ফরিদী–র নাটক থাকতো আর সে সময় যদি তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন তখন আমাদের সঙ্গে বসে সে নাটক দেখতেন। এই তিন অভিনেতা–অভিনেত্রীর নাটক তিনি খুব কম মিস করেছেন। ওনার এ দুর্বলতার কথা জানি। তাই খোজ রাখতাম কবে কোন চ্যানেলে এই তিনজনের একজনের নাটক প্রচার হবে। সে মতো কয়েসভাইকে জানিয়ে দিতাম।

একবার হোসেনভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই কয়েসভাই থেকে গেলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলাম হোসেনভাই উঠে পড়েছেন। কিন্তু কয়েসভাই ওঠেননি। হোসেনভাই চা খেয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

হোসেনভাইয়ের ভেড়ানো দরজা ঠেলে রুমে ঢুকলো তোফা। তারপর টেবিলের ওপর রাখা কয়েসভাইয়ের চশমা নিয়ে এলো। তোফা আমার ছোট ভাই। তার সঙ্গে কয়েসভাইয়ের বেশ ভালো সম্পর্ক। কি কারণে যেন তোফাকে কয়েসভাই খুব বেশি স্নেহ করেন।

তোফা চশমা এনে বললো, ও মজা করবে।

সকাল আটটার দিকে কয়েসভাই ঘুম থেকে উঠলেন। উঠে তোফা তোফা বলে ডাক দিলেন।

বারান্দায় দাড়িয়ে দেখলাম, তোফা রুমে ঢুকছে।

কয়েসভাই বললেন, তোফা কি তার চশমা নিয়েছো?

তোফাকে বলতে শুনলাম, তিন্নিআপাকে দেখেছিলাম সকালে এ রুমে ঢুকেছে। বোধহয় তিনি নিয়েছেন।

কয়েসভাই আমাকে ডাক দেয়ার জন্য বললেন।

তোফা ডাকতে এলো। এসে বললো, কানাভাই (কয়েসভাই) চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এখন যদি সখিনাআপাকে নিয়ে ওনার সামনে দাড় করিয়ে বলি, এই হলো তিন্নিআপা। তাহলে তিনি সে কথা বিশ্বাস করবেন। বলে তোফা আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে সখিনাকে ডাক দিয়ে বললো, তাকে কয়েসভাই ডাকছেন।

সখিনা গেল।

কয়েসভাইকে বলতে শুনলাম, এটা তুমি ঠিক করোনি। এটা তোমার উচিত হয়নি। তুমি জানো, আমি চশমা ছাড়া চলাফেরা করতে পারি না। তারপরও তুমি কোন আক্কেলে আমার চশমা নিয়েছো?

সখিনা বললো, ভাইয়া, আমি তো চশমা নিইনি।

সখিনা কথা বলার পর বোধহয় ধরতে পারলেন তিন্নি এখানে নেই। কয়েসভাই বললেন, তিন্নিকে ডেকেছিলাম। তিন্নি আসেনি? তাকে পাঠাও তো।

সব শুনছিলাম। আমার খুব খারাপ লাগছিল। তোফার এ রকম ফাজলামি করা উচিত হয়নি।

রুমে ঢোকার পর কয়েসভাইকে বললাম, ভাইয়া, আপনার চশমা আমি নিইনি।

কয়েসভাইকে রেগে উঠতে দেখলাম। তিনি বললেন, তিন্নি, প্লিজ চশমা দিয়ে দাও, না হলে... তখন তোফা এসে রুমে ঢুকে কয়েসভাইয়ের হাতে চশমা দিয়ে বললো, ভাইয়া, চশমাটা তিন্নিআপা তার পড়ার টেবিলে রেখেছিলেন।

কটমট করে তোফার দিকে তাকালাম।

তোফা এই দৃষ্টি গায়ে মাখলো না।

এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, কয়েসভাই তখন বলেছিলেন, তিন্নি, তুমি যে অপরাধ করেছো সেটা গুরুতর। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ করে দেবো। বলে চশমা পরেছিলেন। একটু দম নিয়ে বলেছিলেন, আমি আর কখনো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

কয়েসভাই তার কথা রেখেছেন। এই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তিনি কথা বলেননি।

অপরাধ না করেও শাস্তি পাচ্ছি। তোফা এখনো ভয়ে কয়েসভাইয়ের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করেনি। তার ভয়, শেষে যদি এই অপরাধের জন্য নতুন করে শাস্তি দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসা ছেড়ে দেন!

আমি নিশ্চিত, কয়েসভাইয়ের ভুল একদিন ভাঙবে। তখন হয়তো আমার মনের কথাটি তাকে বলতে পারবো।

মৌলভীবাজার থেকে

স্পর্শ

– কামরুল হাসান

সিনেটর হিলারি ক্লিনটনের *লিভিং হিস্ট্রি* পড়তে পড়তে এক জায়গায় চোখ আমার স্থির হয়ে গেল, *যা তুমি তোমার মায়ের কাছে শেখোনি, সেটা পৃথিবী থেকে শেখো।*

কেনিয়ার মাসাই উপজাতিদের এই প্রচলিত কথাটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার আত্মজীবনীতে।

আমার জীবনে আমার মায়ের কাছ থেকে আমি অনেক জেনেছি, অনেক শিখেছি। ভাবতে ভাবতে আমার চোখ দুটো ভিজে গেল। চশমার লেন্স দুটো ঝাপসা হয়ে এলো। চশমাটা খুলে চোখ মুছলাম। ফ্রেমটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিলাম এই সেই ফ্রেম! এটা আমার মায়ের যিনি অনেক দিন আগে এই আনন্দিত পৃথিবী থেকে চলে গেছেন দূরে বহু দূরে একাকী এবং খুব নীরবে অভিমানের নীল বেদনা নিয়ে।

আমার মা যিনি আমার চোখে আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন সত্য এবং সুন্দরের আলো। জ্ঞান, ধৈর্য, সাহস এবং উচ্চাশার আলো। নিজেকে জানার বোঝার এবং বড় করে তোলার আলো। একজন আলোকিত মানুষ হওয়ার আলো। আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির কথা। রবিঠাকুরের *ডাকঘর* তুলে দিয়েছিলেন ক্লাস থৃ-তে আর বঙ্কিমের *রচনাবলী* ক্লাস সেভেনে। এইটে আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন তারাশঙ্করের *গণদেবতা* এবং *ধাত্রী দেবতা।* অনুপ্রাণিত করেছিলেন ডাক্তারি পড়তে। সে আজ কতোদিনের কথা। অনেক পুরনো। তবুও অনেক নতুন।

মা চলে যাবার পর অনেক জিনিস গোছাতে গোছাতে হঠাৎ চশমাটার প্রতি আমার নজর পড়লো। খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। আধুনিক এবং সুন্দর ফ্রেম পরতে পছন্দ করতেন। মেটালিক ফ্রেম। মহিলা-পুরুষ যে কেউ-ই পরতে পারেন।

এক বিকেলে বায়তুল মোকাররমে চশমার দোকানে নিয়ে গেলাম। বললাম লেন্স দুটো খুলে ফ্রেমে আমার পাওয়ার অনুযায়ী লেন্স লাগিয়ে দিতে। চশমাটা পরে আমার ভারী ভালো লাগলো। মনে হলো মায়ের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেমের স্পর্শ যেন মায়ের স্পর্শের মতো আমার সমস্ত মুখ মণ্ডলকে জড়িয়ে রাখছে। মা যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আছেন প্রতিদিনের কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায়। আমাকে আগলে রেখেছেন। জড়িয়ে রেখেছেন। আমার চোখে আলো হয়ে পথ দেখাচ্ছেন। সেই চশমা, সেই মেটালিক ফ্রেম যা ছিল আমার মায়ের খুব প্রিয় এবং একান্ত আপন।

টরন্টো থেকে

quamrulhassan@hotmail.com

অনুকরণ

– নার্গিস

সেই ছোট্টবেলার একটি ঘটনা। আমার আব্বা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। শিক্ষক বলেই কি না জানি না। তার ছিল খুব পড়ার নেশা এবং লেখালেখি করার অভ্যাস।

আব্বা যে ঘরে পড়াশোনা করতেন সে ঘরটিকে আমরা বলতাম *পড়ার ঘর*। সেই ঘরের চারপাশে ছিল বড় বড় আলমারিতে ঠাসা বই। এছাড়াও শেলফে, টেবিলে ছিল অসংখ্য বই এবং দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকা। মাঝখানে ছিল আব্বার পড়ার জন্য বিশাল টেবিল এবং চেয়ার। আব্বার চেয়ারে বসা আমাদের জন্য নিষেধ ছিল। কারণ বেয়াদবি হবে। তার কোনো জিনিসে হাত দেয়া ছিল আমাদের জন্য ভীষণ অপরাধের ব্যাপার। তার পড়াশোনায় যাতে কোনো ডিসটার্ব না হয় সে জন্যই হয়তো বা আমাদের মা আমাদেরকে এসব শিখিয়েছিলেন।

অবশ্য আমাদের সময়ে এগুলো ছিল ছেলেমেয়েদের আদব-কায়দা। আমরাও খুব কড়াকড়িভাবে এগুলো মেনে চলতাম। না হলে শাস্তি অবধারিত।

আব্বার পড়ার সময় পড়ার ঘরে ঢোকাও আমাদের বারণ ছিল। তবে আমি মাঝে মধ্যে নিঃশব্দে আব্বার পড়ার ঘরে ঢুকে অধ্যয়নরত আব্বার পাশে দাড়িয়ে থাকতাম। দেখতাম কি কঠিন মনোযোগ দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আব্বার পড়া! কখনো ভঙ্গিমা পাল্টাতেন, কখনো চশমাটা খুলে খোলা বইয়ের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছু একটা গভীরভাবে ভাবতেন। আবার চশমাটা পাঞ্জাবির খুটে মুছে পড়া শুরু করতেন। আমার ভেতর কি যে হতো, শুধু ইচ্ছা করতো এ রকম মোটা ফ্রেমের একটা চশমা চোখে পরে বারে বারে ভঙ্গিমা পাল্টিয়ে আব্বা সাজতে।

যাহোক, একদিন আব্বার স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। আব্বা পড়ার ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। মায়ের আদেশে কাজের ছেলেটা বারে বারে এসে আব্বাকে সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

শেষে তিনি উঠলেন। একটা বিশাল খোলা বইয়ের ওপর চশমাটা রেখে তিনি গোসল সারতে গেলেন। বাথরুম সারতে তার অনেক সময় লেগে যেতো।

আমি তো মহা খুশি। কিন্তু আমার মনে ছিল না যে, আব্বার আজ দেরি হয়ে গেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলাম। পড়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এসে আয়েশ করে তার চেয়ারে বসলাম। চশমাটা চোখে লাগিয়ে আব্বা সাজার কসরত করতে লাগলাম। তাকে অনুকরণ করে নানান ভঙ্গিমার বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বড় মাপের চশমাটা আমার ছোট মুখে কিছুতেই থাকতে চাচ্ছে না। শুধু পড়ে যেতে চাচ্ছে। সুতরাং বেশির ভাগ সময় আমাকে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আর চোখ এবং মাথা দুটোই কেমন যেন করছে বুঝতে পারছি না। তবুও অসম্ভব একটা ভালো লাগা অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো সারাটা সময়। কখনো চেয়ারে হেলান দিচ্ছি, কখনো কাত হয়ে থুতনিতে হাত রেখে উপরের দিকে তাকাচ্ছি। কোথায় কোন সুদূরে চলে গেছি নিজেও জানি না। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

আব্বা আমার পাশে দাড়ানো আর বলছেন, দাও, চশমাটা দাও। এক্ষুণি যেতে হবে।

আমার কি হলো জানি না। ঢলঢলে চশমাটা এক নিমিষেই নাক থেকে খুলে পড়ে গেল। দুটো গ্লাস আলাদা হয়ে গেল।

থর থর করে কাপছি। কান্নার শক্তি নেই। পালানোর শক্তি নেই। দুই হাটু ঠক ঠক করছে। বাঘের মতো রাগী আমার আব্বা। আজকের এতো অন্যায়ের শাস্তির কথা চিন্তা করে আমি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। ঠায় দাড়িয়ে আছি। কি করবো বুঝতে পারছি না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আব্বার মুখের দিকে।

আব্বা জোরে ধমক দিয়ে বললেন, খুব ভালো করেছো। এখন উপায়? তারপর ঝড়ের বেগে ড্রয়ার থেকে একটা পুরনো চশমা বের করে তিনি রাগতে রাগতে চলে গেলেন।

আমার মাথায় বাজ পড়া অবস্থায়ও মনে হয় দেখলাম আব্বা হাসি লুকাচ্ছেন। বোধগম্য হলো না আব্বার এই অস্বাভাবিক আচরণ। আমি ভ্যা ভ্যা করে জোরে কাদতে থাকলাম।

আমার এই শাদামাটা লেখাটা হয়তো ছাপা হবে না। তবুও আমি শান্তি পাচ্ছি এতোদিন পর একটা লেখা শেষ করলাম বলে। সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝি আব্বার হাসির কারণ।

ঢাকা থেকে

ইমাম

– মোহাম্মদ শিবলী নুমানী

খালেদ হামলা সামহান নামে হজ কাফেলাটি কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশিদের কাছে এক নামে পরিচিত। এই হামলার মালিক হলেন আমার বড় মামা। কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর সদস্যদের পবিত্র ওমরাহ হজ পালনের জন্য সউদি আরবে নিয়ে যাওয়ার কন্ট্রাক্ট পেলেন তিনি।

মামা আমাকে বললেন, ওমরাহ হজ পালন করতে যাবি? বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতে পারবি, তাতে যথাযথভাবে ওমরাহ পালন করতে পারবি। কারণ তারা শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন।

মামার কথায় চিন্তা–ভাবনা না করে এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য ২৮ জুন ২০০০ সালে সউদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। পাহাড়ে ঘেরা এবং ইসলামি শিল্পকলায় পরিপূর্ণ আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরিফ খুব কাছ থেকে দেখলাম আর আল্লাহপাকের প্রশংসা করতে লাগলাম।

এরই মধ্যে নামাজের আজান হলো। সবাই যে যেখানে ছিল নারী, পুরুষ এক সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে নামাজে দাড়িয়ে গেলাম। ইমাম যখন নামাজের মধ্যে কোরআনে তেলওয়াত শুরু করলেন তখন আমার মনে হলো যেন আসমান থেকে কোরআন নাজিল হচ্ছে আর মানুষগুলো অঝোর ধারায় কাদছে। সত্যিই এমন সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলওয়াত কখনো শুনিনি।

আমার সঙ্গে থাকা মেজর ডা. ইফতেখার নামাজ শেষে আমাকে সঙ্গে করে অডিও ক্যাসেটের দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকানিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম ইমামের নাম শায়েখ আবদুর রহমান সুদেছ। মেজর ইমামের কোরআন তেলওয়াতের রেকর্ডকৃত সিডি ক্যাসেট কিনে মনকে শান্ত করলেন। আর আফসোস করতে লাগলেন যদি সারা জীবন এই ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে পারতাম!

আমিও ইমামের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য মনে মনে *ইরাদা* করলাম। পরের দিন শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে *বাবে মালিক ফাহাদ* (কাবা শরিফের একটি দরজার নাম)–এর কাছে দাড়িয়ে গেলাম। কারণ এ দরজা দিয়েই ইমাম বের হয়ে আসবেন। অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ দেখতে পেলাম ইমাম সম্পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তায় এগিয়ে আসছেন। আর দূর থেকে দৌড়ে এসে পুলিশি বেষ্টনী ভেদ করে আরবের যুবক ছেলেরা ইমামকে চুমু খাচ্ছে। তার মুখমণ্ডল যেন পবিত্রতার ছোয়ায় আলোকিত হয়ে ফুটছে।

যতোই দেখি ততোই মুগ্ধ হতে লাগলাম। চোখের চশমাটি যেন তার সৌন্দর্যটাকে দ্বিগুণ করে ফুটিয়ে তুলছে। অপলক দৃষ্টিতে ওনার দিকে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে রইলাম। আর মনের আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম।

আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় হাত মেলানোর জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি হাত না মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অনেক দূর চলে গেলেন। জায়গায় স্থির দাড়িয়ে রইলাম এবং মনে মনে দুঃখ পেলাম। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি ইমাম পেছনের দিকে আসছেন।

পুলিশসহ সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল ঘটনা কি? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইমাম ঠিক সামনে এসে আমার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

যেহেতু আমি আরবি ভাষায় কথা বলতে পারি, সেহেতু আমিও তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম।

পরিশেষে আল্লাহপাকের আরেকবার প্রশংসা করলাম আর মনে মনে দোয়া করতে লাগলাম হে, আল্লাহ! এদের মনের চশমায় এবং চোখের চশমায় মুহূর্তের মধ্যে ভালো, মন্দ উপলব্ধি করার যে জ্ঞান দিয়েছো, আমাদের সবাইকে সে জ্ঞান দান করো।

কুয়েত থেকে

shebliee_nomine@yahoo.com

ভিলেইন

– মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম

হালকা পাতলা রাস্তায় গাড়ি চলছে। কাছারি মোড়ে ট্রাফিকসহ সার্জেন্ট ডিউটিরত। রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চড়ে দিনাজপুর পৌরসভার দিকে আসছি। আমার সাইকেলের পেছনে আসছে এক মোটর সাইকেল আরোহী।

ট্রাফিক সার্জেন্ট হাত তুলে থামতে বললে আমি একটু চমকে উঠি। পাশে এসে থামলাম। থেমে নিজেকে একটু অপরাধী মনে হতে লাগলো। আবার মনে হলো, আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। তাহলে ট্রাফিক সার্জেন্ট কেন থামতে বললো? নানান চিন্তায়।

এরই মধ্যে দেখি আমার পেছন থেকে আসা মোটর সাইকেল আরোহী থেমে তার কাছে গেল। যেহেতু আমাকে কোনো ইশারাই আর করছে না, এতোক্ষণে হাফ ছেড়ে বাচলাম। আমার স্বাভাবিকতা ফিরে এলো।

এরই মধ্যে দেখি মোটর সাইকেল আরোহী তার কাগজপত্র সব দেখালো। কিন্তু ট্রাফিক বাড়তি টাকা নেয়ার অজুহাত খুজলো।

হেলমেট নেই কেন?

আরোহী সে জন্য মাফ চাইলে ট্রাফিক সার্জেন্ট বললো, শুধু শুধু মাফ করা যায়? দেন, মাল দেন।

কিন্তু মোটর সাইকেল আরোহী বলেন, এটা আপনার অন্যায় হচ্ছে।

বলার সঙ্গে হিংস্র নেকড়ের মতো ট্রাফিক সার্জেন্ট মোটর সাইকেল আরোহীর ওপর চড়াও হয় এবং কিল-ঘুষি মারতে থাকে।

আত্মরক্ষার্থে আরোহী তার ওপর চড়াও হলে শুরু হয় মল্লযুদ্ধ।

এরপর আরো ট্রাফিক দুজন এসে মোটর সাইকেল আরোহীকে নিবৃত্ত করে ও তাকে নিয়ে যায় থানায়। এবং মামলা করে।

যে কারণে আমি ইশারা ভুল করেছিলাম তা হলো, ট্রাফিক সার্জেন্টের চোখে ছিল দামি চশমা, যা ভিইলেনের চোখে দেখা যায় বাংলা ছবিতে। ভিলেইন রূপী এই ট্রাফিক সার্জেন্টের ভিলেইনি চশমা আমার কম্পনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ আচরণই প্রমাণ করলো ভিলেইন চশমা পরিহিত ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে তর্কে লাভ নেই।

দিনাজপুর থেকে

সার্থক আমি

– এইচ.এম শহীদ

সকাল থেকে শ্রাবণের বৃষ্টি। কাচপুর-মদনপুর এলাকায় যাযাদি পাওয়া যায় না। তাই প্রতি মঙ্গলবার চিটাগাং রোড অথবা যাত্রাবাড়ি গিয়ে যাযাদি নিয়ে আসি। ভিড় এড়াতে ও বয়সের কারণে হিমালয় পরিবহনের গাড়িতে যাওয়া-আসা করি।

মঙ্গলবার বিকেলের দিকে বৃষ্টি সামান্য ছুট দিলে আমিও যাত্রাবাড়ি যাই এবং ফিরতি বাসে যাযাদি নিয়ে বাসে উঠে বসি। বাসে বসে আয়েশি ভঙ্গিতে চোখে চশমা এটে *ইরাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘাতকের বিশ্বাসযোগ্যতা* দিয়ে পড়া শুরু করি। কাচপুর বৃজ পার হতেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। পড়া বন্ধ। চশমা গুটিয়ে চুপচাপ।

বাস থেকে নেমে হাটা পথে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কিছু দূর আসার পর বৃষ্টি। দ্রুত রওনা দিলাম বাসার। সামনে কাদামাটির রাস্তা। পাশেই পুকুর। পা পিছলে একেবারে পুকুরে। কোনো প্রকারে উঠে এলাম। জামা-কাপড় যাযাদি ভিজে একাকার। মেয়ে যাযাদি নিয়ে উনুনে শুকাতে দিল।

এক কাপ চা নিয়ে সোফায় বসে মেয়ের কাছে যাযাদি ও চশমা চাইলাম। যাযাদি পেলাম, চশমা নেই। অনেক খোজাখুজির পরও চশমা পাওয়া গেল না। চশমা ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। বিছানায় শুয়ে বই পড়া পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের অভ্যাস।

রাতের খাবার খেয়ে দুঃখ নিয়ে শুয়ে আছি।

মেয়ে চুপি চুপি এসে মাথায় হাত রেখে বললো, আব্বা, আমি পড়ে শোনাই, তুমি শুনতে শুনতে ঘুমানোর চেষ্টা করো।

দিনের পর দিন পড়তে বললাম।

দুই দিন পরে সকালে ছেলে পুকুর থেকে চশমা উদ্ধার করে নিয়ে এলো। সার্থক পিতা আমি। কি আনন্দ!

ফুলহর, মদনপুর, নারায়ণগঞ্জ থেকে

অন্তর্দৃষ্টি

– ইলিয়াস

তখন সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভার্সিটি কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছি। বরাবরের মতো প্রথম দিনই বিলম্ব। এখানে *বরাবর* শব্দটা ব্যবহারের কারণ হিসেবে পাঠকের কাছে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

যখন নটর ডেম কলেজে পড়তাম তখন বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় এই *বিলম্ব* শব্দটার কারণেই সকালে তিন টাকা ভাড়ার ট্রেন মিস করে বারো তেরো টাকা খরচ করে বাসে চড়ে কলেজে যেতে হতো।

যাই হোক। ক্লাসে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পুরো ক্লাস শেষের সারিতে একটি বেঞ্চে একটি সিট অবশিষ্ট দেখলাম। দ্বিধা না করে বসে গেলাম সেটিতে। লেকচার শুরু হলো। তারও দশ পনেরো মিনিট বাদেই দরজা থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো।

আসতে পারি? মোটা গ্লাসের চশমা পরা একটা মুখ।

ক্ষণিকের জন্য সব ছাত্রছাত্রীরা দৃষ্টিবন্দী হলো।

আর কোনো সিট অবশিষ্ট না থাকার দরুণ বলতে গেলে অনেকটা বাধ্য হয়েই মেয়েটা আমার পাশে এসে বসলো।

ফিশফিশিয়ে বললাম, আমি ফুয়াদ, আপনি?

মোটা গ্লাসের চশমার নিচে বড় বড় চোখের তারায় দৃষ্টি একীভূত আমার। জবাব এলো, আখি।

চোখে চশমা দেখে কৌতূহলবশত আবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আখি, নিজেকে এতো মোটা গ্লাসে বন্দী করে রেখেছেন কেন?

উত্তরটা ক্লাসের পরে পাবেন। সহাস্যে জবাব দিল সে।

ক্লাস শেষে আখি নিজ থেকেই জবাবটা দিল। আসলে সবার মনেই আরো একটা চোখ রয়েছে। আমার মনের চোখের দৃষ্টিশক্তি খুবই বেশি তো, তাই সৃষ্টিকর্তা বাইরের চোখ দুটো থেকে কিছুটা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আর সে কারণেই কৃত্রিম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এই মোটা লেন্সের চশমা।

হাসলাম আর বললাম, দারুণ জবাব।

পরের দিনও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির দরুণ দুজনকেই আবারও ওই বেঞ্চটিতে বসতে হলো। কথাবার্তার মাধ্যমে এক ধরনের বন্ধুত্বও হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ওই বেঞ্চখানি আমাদের দুজনের জন্যই বরাদ্দ হয়ে গেল। ক্রমেই বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তায় অল্প দিনেই আমাদের সম্পর্ক আপনি থেকে তুমি পেরিয়ে তুইতে এসে পৌছালো।

ক্লাস শেষে প্রায়ই আমরা রিকশায় চড়ে চলে যেতাম নদীর ধারে। আখি আমার হাতে তার চশমাখানি দিয়ে বলতো, ধর, আমার চোখ দুটো অল্প সময়ের জন্য তোকে দিলাম। এই বলে সে এক দৃষ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে থাকতো।

বন্ধুত্বের খাতিরে আমরা দুজনেই দুজনের বাসায় যাওয়া–আসাও করতাম। এতে করে আখির ছোট ভাই আসিফের সঙ্গেও এক রকম হৃদ্যতা গড়ে উঠলো আমার।

আখি প্রায়ই বলতো, এলাকার কিছু মাস্তান ধরনের বাজে ছেলেপুলে তাকে প্রচণ্ড বিরক্ত করে।

আরে, সুন্দরীদের জন্য এটাও এক ধরনের প্রাপ্তি। হেসে বলতাম।

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। সকাল সকাল আখি একটা বুকে নিয়ে আমাকে উইশ করার জন্য বাসায় এলো। সঙ্গে একটা চিরকুট।

বোকা বন্ধু। তোর অনুভূতির চোখের দৃষ্টিশক্তি খুবই কম। অনুভূতির চোখে চশমা লাগিয়ে দেখে নে আমাদের বন্ধুত্বে। শুভ জন্মদিন বন্ধু।

আখি।

চিরকুট পড়ে তার দিকে তাকানো মাত্রই লক্ষ্য করলাম তার মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ।

কি রে, কি হয়েছে?

খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

ঘটনাটা কি? পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

সে জানালো, মহল্লার সেই ছেলেগুলো যারা অনেক দিন ধরেই তাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে থেকে একজন আজ আসার পথে তাকে একখানা প্রেমপত্র নিবেদন করেছিল। আর আখি ওটা না পড়েই ছেলেটার সামনেই তা ছিড়ে ফেলেছে এবং উপর্যুপরি ছেলেটার গালেও একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে।

তারও সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা। আখি একদিন ক্লাসে এলো না। পরের দিন সকালেই ফোন করলাম।

আসিফ ফোন তুললো।

আসিফ, আখিকে একটু দাও তো।

ফোনে আসিফ যা জানালো তা শুনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না।

আপুকে তারা এসিড মেরেছে। আপু এখন হাসপাতালে। বলেই আসিফ কেদে ফেললো।

হাসপাতাল আর রুম নাম্বার নিয়ে রিসিভার রাখামাত্রই রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম হাসপাতালে।

শাদা চাদরে সম্পূর্ণ শরীরটা ঢাকা আর মুখে ব্যান্ডেজ। রীতিমতো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আখি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছি না। একি হয়ে গেল! আখি আমাকে দেখেই মুখে একটু বাকা হাসি আর বিড় বিড় করে কিছু কথা বললো। চোখ বেয়ে পানি নেমে এলো নিঃশব্দে তার।

কথাগুলো শোনা মাত্র নিজের উদগত অশ্রুকে কোনো রকমে রোধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জানলাম তার বাবা কেস করেছেন। আসামি এখনো পলাতক।

সেদিন সন্ধ্যায়ই খবর পেলাম আখি আর নেই। হৃদয়ের প্রতিটি কোষে কোষে যেন কেমন ব্যথা সঞ্চারিত হলো। সব এলোমেলো হয়ে গেল।

তার বাসায় গেলে আসিফ আমার হাতে তুলে দিল সেই চশমাখানি, সেই দুটো চোখ। আপু এটা আপনাকে দিতে বলেছিল।

দেশের ওপর একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ জমে উঠলো। ক্ষোভ জন্মালো এই নোংরা সমাজ ব্যবস্থার ওপর আর সেই নোংরা হৃদয়গুলোর ওপর। ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেয়া হলো না। চলে এলাম ইনডিয়ায়। সঙ্গে সেই দুটো চোখ, সেই চশমা।

চশমাখানি স্মৃতিতে ভাসলেই কানে ভেসে আসে সেই বিড় বিড় করে বলা কথাগুলো।

তারা আমার মনের চোখটাকেও নষ্ট করে দিল ফুয়াদ। আমি আর বাচতে চাই না।

মহারাষ্ট্র, ভারত থেকে

elias_no_tears@rediffmail.com

কৌতূহল

– বহ্নি

সেই ছেলেবেলার কথা। প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাই স্কুলে পড়ছি। লেখাপড়া আর দুষ্টুমি ছাড়াও তখন আরো কিছু কিছু ব্যাপারে খেয়াল দিতে শুরু করেছি।

বেশ কয়েকজন শিক্ষক চশমা চোখে ক্লাসে আসতেন। বই খুলে পড়াতে গিয়ে খেয়াল করতাম স্যার মাঝে মধ্যেই চশমা চোখে রেখেই এদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করতেন। আবার কখনো চশমা খুলে কাপড় দিয়ে মুছে আবার চোখে দিতেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভাবতাম, এটা বুঝি বা তার চশমার প্রতি অন্যদের আকর্ষণ করার কোনো কৌশল। অথবা সময় পার করার কোনো কৌশল।

একজন গুরুগম্ভীর টাইপের স্যার ছিলেন। ওনাকে দেখতাম বইটা মেলে ধরেই ঘাড়টা উপরে-নিচে নামানোর কসরত করছেন।

চশমা পরে বীরত্ব জাহির করার যে বিভিন্ন পন্থা আছে তা বেশ বুঝে নিলাম। তবে এ নিয়ে ক্লাসের কারো সঙ্গে তেমন আলাপ করার ফুরসত ছিল না, বাসায়ও কেউ চশমা ব্যবহার করার মতো ছিল না। তাই এই কৌতূহলটা মনের সংগোপনেই থেকে যায়।

এখন বয়স হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে চোখে চশমা উঠেছে। নিজের ছেলেদের মাঝে মধ্যে পড়ার টুকিটাকি দেখাতে গিয়ে বা অবসরে পত্রিকা পড়তে গিয়ে আমাকেও মাঝে মধ্যে ঘাড় উঠা-নামা করাতে হয়। ঘামে চশমা ঝাপসা হয়ে এলে খুলে নিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে আবারও চোখে পরতে হয়। এসব করার মাঝে বীরত্বের কিছু তো খুজে পাই-ই না, সংসারের তাড়াহুড়ো কাজের সময় চশমা খুলে মুছে নেয়াটা অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাড়ায়। এতে অবশ্য লাভ একটাই হয়েছে। ছেলেবেলার সেই কৌতূহল ষোলআনাই মিটেছে!

রামপুরা থেকে

প্রথম ও শেষ

– উত্তম অধিকারী

আজ থেকে নয় দশ বছর আগের ঘটনা। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। সামনে আমার বৃত্তি পরীক্ষা। রাত–দিন পড়াশোনা করছি।

একদিন জানালার ধারে বসে পড়ছি। এমন সময় দেখি আমাদের পাড়ার সবচেয়ে দুরন্ত ও দুষ্ট ছেলে বলে পরিচিত সুমন এসে আমাদের বড়ই গাছে বসা পাখি গুলতি দিয়ে মারছে।

আমি জানালা দিয়ে সুমনের দিকে তাকাতেই সে বলে, উত্তমদা, আপনার চোখ নিরিখ (লক্ষ্য) করে গুলতি মারবো। দেখেন আমার হাতে কি এইম।

এ কথা বলাও সারা এবং আমার চোখ লক্ষ্য করে গুলতি মেরে দেয়াও সারা।

আমি মাথা নিচু করতে না করতে গুলতিটা এসে আমার ডান চোখে লাগলো।

মরে গেছি মাগো বলে এক চিৎকার দিয়ে চোখ ধরে আয়নার সামনে গেলাম। বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে আয়নাতে তাকালাম। কিন্তু হায়! আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ডান চোখ কি তাহলে অন্ধ হয়ে গেল? আমি কি আর কখনো দেখতে পাবো না? এ রকম বিভিন্ন প্রশ্নের মাঝে আমার বুক দুরু দুরু করে কাপতে থাকে।

ইতিমধ্যে আমার চিৎকার শুনে মা দৌড়ে ঘরে চলে এসেছেন। আমার জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যাওয়া চোখ দেখে মা সংক্ষেপে আমার কাছে ঘটনাটা শুনে চিৎকার শুরু করলেন।

মায়ের চিৎকারে সারা পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল।

মা কাদতে কাদতে বলেন, আমার ছেলের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তোর চোখ (সুমনের) তুলে এনে আমার ছেলের চোখে লাগাবো।

পুত্র বাৎসল্য একেই বলে!

এরপর আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার চোখ দেখে ডিশ এন্টেনার সাইজের এক জোড়া কালো চশমা দিলেন।

ওই চশমা পরে স্কুলে গেলাম।

আমাদের ইংরেজির শিক্ষক দেবাশীষস্যার আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি আমার মাস্তান মার্কা কালো চশমা দেখে রেগে বললেন, তোমাকে তো ভদ্র ও মার্জিত বলেই জানতাম। সিনেমার ভিলেনইদের মতো *ছাতা মার্কা* তিন কেজি ওজনের চশমা পরে মাস্তান সেজেছো। রুচিহীন ছেলেপেলে এগুলো চোখে দেয়। ভালো ছাত্রদের বৈশিষ্ট এটা নয়।

স্যারের কথাতে খুব দুঃখ পেলাম। হাউমাউ করে কেদে ফেললাম। চশমা খুলে চোখ দেখিয়ে স্যারকে সব ঘটনা খুলে বললাম। আমার ডান চোখের পাতা দুটো ফুলে চোখটি পুরোপুরি ঢেকে গেছে।

হঠাৎ এ রকম চোখ দেখে স্যার ভড়কে গেলেন। কাছে ডেকে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, উত্তম, আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম সো সরি ফর দিস।

আমার অন্ধ প্রায় চোখের দিকে তাকিয়ে স্যার চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

স্যারকে জড়িয়ে ধরেই বললাম, স্যার, আমার চোখটা ভালো হয়ে গেলেই চশমা খুলে ফেলবো।

স্যার করুণ কণ্ঠে বললেন, আমি আশীর্বাদ করি, তুমি খুব তাড়াতাড়িই যেন চশমা খুলে ফেলতে পারো।

স্যারের আশীর্বাদে তার এক মাস পরেই চশমা খুলে ফেলেছিলাম। আজ পর্যন্ত আর কোনো চশমা পরিনি।

ওটাই আমার জীবনের প্রথম চশমা। আমার জীবনের শেষ চশমা।
আমার মতো চশমা পরার ভাগ্য যেন কারো না হয়।

রাজশাহী থেকে

ফুলদি

– মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ

ফুলদি আমার একমাত্র বোন। পড়াশোনায় খুব কাচা। ঘটনাটা যে সময়ের তখন আমরা দুজনেই টেন–এ পড়ি।

যেদিন আমাদের হাউস টিউটর বিকেলে গণিত পড়িয়ে গেলেন তারপর ফুলদি সন্ধ্যার পর নিজ রুমে বীজগণিতের মান নির্ণয়ের অংকগুলো কষতে চেষ্টা করছিল। ওই দিনই টিউটর তাকে ওই অধ্যায়টা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

কি মনে করে যেন ফুলদির রুমে গিয়ে দেখি সে তার মোটা লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে।

ফুলদিকে, কি করছিস, জিজ্ঞাসা করতেই বোকা বোকা হাসি দিয়ে বললো, অংকগুলো বুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।

আমি ক্লাসের প্রথম দিককার ছাত্র ছিলাম। সুতরাং অংকগুলো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রথমবার বোঝানোর পর বললাম, বুঝেছিস?

জবাবে ফুলদি না বোধক শব্দ করলো।

আবারও আমার সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং জানতে চাইলাম বুঝেছে কি না।

এবারও সে বললো, না।

তারপর আবারও বোঝালাম।

এবারও উত্তর এলো বোঝেনি।

এভাবে কয়েকবার বোঝানোর পরেও উত্তর এলো বোঝেনি। ক্রমাগত না বলাতে আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। আমি তার কপাল বরাবর ডান হাত চালালাম। হাতের আঘাতে ফুলদির চশমার বাম পাশের কাচ খুলে দূরে ছিটকে পড়লো।

হাতের আঘাতে চশমাটা চোখ থেকে সরে যাওয়ায় সে চশমাটা খুলে মুছে আবার পরলো। চশমার যে বাম পাশের কাচটা খুলে পড়ে গেছে সেটা ও লক্ষ্য করেনি।

তার অবস্থা দেখে হাসবো, না কাদবো বুঝতে পারছিলাম না। ফুলদিকে বললাম, চোখে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিস? বললো, হ্যা। কিন্তু বাম চোখে কেন যেন একটু সমস্যা হচ্ছে। এই বলে সে আবার চশমাটা খুলে কাচ দুটো (!) মুছে চোখে দিল।

এবার আর হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, তুই এই চশমা দিয়ে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিস?

ও হ্যা বলতেই একটা আঙুল চশমার বাম পাশের বাকা অংশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতেই সে বুঝতে পারলো যে, সেখানে কাচ নেই। এবার নিজের বোকামি বুঝতে পেরে আমার সঙ্গে গলা মেলালো বাধ ভাঙা হাসিতে।

পাবনা থেকে

ভাগিনা

অনেক দিন আগের কথা, দিনক্ষণ আমার সঠিক মনে নেই। আমার বড় বোনের একটি ছেলে হয় আমাদের বাড়িতে। আর আমরা ভাইবোন সবাই বড় হয়ে যাওয়াতে, আমাদের পরিবারে আমার ভাগিনার আগমন যে কতোটা আনন্দের তা একমাত্র আমরাই অনুভব করতে পারছি। আমার মা-বাবা কতোটা যে আদর করতেন, বিশেষ করে আমার বাবার তো সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়ার অবস্থা হয়েছে। ভাগিনার নামটিও আমার বাবা রাখলেন, রুমন। অবশ্য ডাক নাম।

যাই হোক। মাস তিনেক আমাদের বাড়িতে থাকার পর আপা বাচ্চাসহ নিজ বাসায় চলে গেলেন। আর তখন আমাদের পরিবারের সদস্যদের অবস্থা হলো, যে যখন সময় পায় আপার বাসায় চলে যাওয়া।

এর মধ্যে কয়েক বছর চলে গেল। ভাগিনার পাচ ছয় বছর হওয়ার পর চোখের সমস্যা দেখা দেয়। ডাক্তার চশমা পরতে বলেন। সে লেখাপড়ায় ভালো ছিল। চশমা কখনো খুলতো না গোসলের সময় ছাড়া। ঘুমাতো চশমা পরে। আমি বলতাম, ঘুম আসার সময় চশমার দরকার হয় না।

রুমন তখন রাগ হয়ে আমাকে বলতো, তুমি জানো না, আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখি না।

আমি আবার বলতাম, ঘুম এলে তোমার চোখ বন্ধ থাকে। তুমি কিভাবে দেখো?

রুমন তখন আরো বেশি রাগ হয়ে বলতো, আমি ঘুম এলেও চোখে দেখি। তাই আমি চশমা পরে ঘুমাই।

ভাগিনা এখন অনেক বড় হয়েছে। আমি আমার প্রবাসী জীবন পার করলাম অনেকগুলো বছর। মাঝে মধ্যে আপার বাসায় ফোন করি, বিভিন্ন কথা হয় এর মাঝে আমার জানতে ইচ্ছা করে রুমন কি এখনো চশমা পরে।

উত্তরে আপা বলেন, এখনো রুমন চশমা পরে ঘুমায়। আর আমি ঘুম আসার পর চশমা খুলে টেবিলে রেখে আসি।

আমার প্রবাসী জীবনে মাঝে মধ্যে মনে পড়ে ভাগিনার চশমা ও রেগে যাওয়া সেই কথা। পরিশেষে ভাগিনার দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

নামবিহীন, সিংগাপুর থেকে

আন্ডারগ্রাউন্ড

– আবু মুহম্মদ শাকুরুল আলম তুষার

খোকনভাইয়া আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। অস্পষ্টভাবে মনে আছে, তিনি যখনই আমাদের বাসায় আসতেন, প্রায়ই আমাদের তিন ভাইবোনের জন্য নানান রকম খাবার, বিশেষত চকলেট, বিস্কিট নিয়ে আসতেন। ভাইয়া এলেই আমাদের মজার অন্ত থাকতো না। স্কুল থেকে ফিরেই নানান রকম বায়না ধরতাম। কখনো শিশু পার্ক, কখনো ইগলু আইসক্রিম পার্লারে। আবার সারা বিকেল রিকশা বা পায়ে হেটে চলতো নগর ভ্রমণ।

আম্মুর বকুনিতে রাতের পড়ার পাঠ শেষ করে আমরা সবাই মিলে তাকে ধরতাম গল্প বলার জন্য। বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, নানান বিখ্যাত মুভির কাহিনী, আরো হরেক রকম জানা– অজানা বিখ্যাত গল্প তার বাগ্মিতায় আমাদের ছোট হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ জাগাতো। কখনো এমন হয়েছে, গল্প শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে গেলে তিনি সবাইকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসতেন।

এই সদা চঞ্চল মানুষটিকে কখনো মনে পড়ে না যে, দুঃখিত হতে দেখেছি। তিনি ঢাকায় এসে প্রায় প্রতিবারই সাত থেকে দশ দিন থাকতেন। সারা সকাল, দুপুর নানান এমবাসি ঘুরতেন। তার একটাই ইচ্ছা

ছিল ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে বিদেশ গমন। তার নিজের চেষ্টাতেই একবার তিনি মালয়শিয়া গিয়ে তিন বছর থেকে এলেন। কিন্তু তেমন কোনো টাকা আয় না হওয়াতেই তার প্রত্যাগমন।

দেশে ফিরে তিনি আবার ভালো কোনো দেশে যাবার চেষ্টায় লেগে গেলেন। ততোদিনে আমরাও কিছুটা বড় হয়েছি। তার নিজের প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার কষ্ট, সৎ চাকরিজীবী মেজখালুর তিন সন্তানের ভরণপোষণ, লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সংগ্রামে টিকে থাকার কষ্টগুলোকে কিছুটা বুঝতে শিখেছি।

শেষবার বিদেশ যাবার আগের সময়গুলোতে তার বলা গল্পের শেষে কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাস পড়তে দেখেছি। ছোটবেলার স্মৃতির আচড়ে তার বেশি পাওয়ারের চশমাটা খুলে মাঝে মধ্যে চোখ মোছার দৃশ্য আজো অম্লান। এভাবে নানান চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক সকালে আমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংগাপুর-এর এক হেভি মেশিনারি কম্পানির সুপারভাইজার হিসেবে তিন বছরের চুক্তিতে তিনি চলে গেলেন।

প্রথম দুই বছর তিনি প্রতি মাসে চিঠি লিখতেন। খালার কাছে টাকা পাঠাতেন। তার পাঠানো টাকায় এক সময় মেজখালু রাজশাহীতে অভিজাত আবাসিক এলাকায় জায়গা কিনলেন। নিজেদের সংসারটা আরেকটু গুছিয়ে নিলেন, ছোট দুই ভাইবোনের লেখাপাড়ায় স্বাচ্ছন্দ এলো।

তৃতীয় বছর থেকে ধীরে ধীরে তার চিঠি লেখা কমে যেতে থাকলো, সেই সঙ্গে টাকা পাঠানোও বন্ধ হলে গেল। খালু-খালা চিন্তিত হলেন তার ঘন ঘন ঠিকানা পরিবর্তনে। এক সময় দেখা গেল নির্দিষ্ট ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে দিলে তা ফেরত আসতে লাগলো। সেই থেকে দুর্ভাবনার শুরু। এর মাঝে আমার খালাতো বোনটির বিয়ে হয়ে গেল। অনার্স পর্যন্ত পড়া চালিয়ে খালাতো ভাইটি সিটি কর্পরেশনে চাকরি নিলেন।

তিন বছর পর ১৯৯৪ সালে মেজখালুও চাকরি থেকে অবসর নিলেন। তিনজনের সংসারে খালাতো ভাইটি তার স্বল্প আয়ের চাকরি নিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন।

মাঝে মধ্যে পরিচিত জনেরা নানান খবর নিয়ে আসতেন খোকনভাইয়া সম্পর্কে। কেউ বলতেন, তিনি নাকি ফিলিপিনো মেয়েকে বিয়ে করে আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশনে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু কাউকেই তিনি তার সঠিক ঠিকানা দিতেন না।

এভাবে চলতে চলতে ১৯৯৮ সালে মেজখালু মারা গেলেন। আপনজনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তারা মনের দিক থেকেও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

পরীক্ষায় ভালো ফল করার আনন্দের মাঝেও কোথায় যেন একটা বেদনা জেগে রইলো। চোখের সামনে অতি আপন একটি পরিবারের দুর্দশা আমাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতো।

দুই বছর পর তখন মেডিকালের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমার খালাতো ভাই ঢাকায় এসে খোকনভাইয়ার একটা ছবি দিলেন যেখানে তিনি সদাচঞ্চল ও সঙ্গে এক মঙ্গোলিয়ান চেহারার রমণী। খালাতো ভাইয়ের সিটি কর্পারেশনের মেয়র অফিশিয়াল টুরে সিংগাপুরে গেলে খোকন ভাইয়ার কয়েকজন বন্ধু, আগের পরিচিত ও বন্ধুসম মেয়র জানান, দুদিন আগে আততায়ীর গুলিতে খোকনভাইয়া মারা গেছেন। তিনি ফিরে এ খবর খালার বাসায় গিয়ে দিয়েছেন এবং এমবাসির মাধ্যমে লাশ বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে সাহায্যের কথাও বলেছেন।

এমবাসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা খোকনভাইয়ার লাশের খবরের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীনতা দেখায়। তবে উপর মহলের চেষ্টায় তারা খোজখবর নিয়ে খোকনভাইয়ার চশমাটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। প্রথমত আমরা অবিশ্বাস করলেও চশমাটি পাবার পর খালা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেই কালো ফ্রেমের

চশমাটাই তার মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এরপর আরো তিন বছর চলে গিয়েছে। খোকনভাইয়ার চশমা আর তার কথা মনে পড়লে অজান্তেই আমার শাদা ফ্রেমের নিচের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

মিটফোর্ড, ঢাকা থেকে

আলো নিভে গেলে

– মোহাম্মদ মোহসীন ভুঞা

নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনালের ভেতর দিয়ে হেটে গেলে এক পর্যায়ে কাঠের কিছু সেতু পাওয়া যেতো। এটা মূল টার্মিনাল থেকে লঞ্চ ভেড়ার জায়গাকে যুক্ত করেছে। ছেলেবেলায় ওই সেতু অতিক্রম করে লঞ্চে ওঠার সময় একজন ভিক্ষুককে প্রায়ই দেখতাম।

প্রতি বছর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা হতো। কিন্তু আমাকে সে দেখতে পেতো না। তার চোখে কালো চশমা থাকতো। চশমা চোখে দেয়ার কারণ ওই বয়সে বুঝিনি। অনেক পরে জেনেছি, জলবসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় তার চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যায়। তার আলোর পৃথিবী হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে যায়। অথচ আগেও সে পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পেতো।

একজন দৃষ্টিহীন মানুষের করুণ কথা শুনে তখন বেদনাহত হয়েছি। কালো চশমা পরলে সূর্যের আলোর তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া অনেক শিশু তার চোখ দেখে ভয় পাওয়ায় তাকে চশমা দিতে হয়। আমাদের পাড়ায় এক দার্শনিক পাগল থাকতেন। সে বয়সে তার অনেক কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটা করে নতুন বাক্য বলতেন। পরের সপ্তাহে দেখা যেতো অন্য একটা বাক্য আওড়াতে আওড়াতে হেটে যাচ্ছেন। তার একটা কথা ছিল, *চোখের আলো নিভে গেলে কাজল দিয়ে কি হবে*।

কথাটার মর্ম বোঝায় বয়স তখন হয়নি। তবে আমার হৃদয়কে উদাস করে দেয়া ভিক্ষুকের কথা চিন্তা করে মনে হয়েছে, চোখের আলো নিভে গেলে চশমা দিয়ে অনেক কিছু হবে।

আমাদের দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মিজান চৌধুরী বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করতেন। পরবর্তী কালে অলি আহাদকেও দেখেছি, ওই সময় তাদেরকে অন্ধ ভেবে ভুল করতাম।

এখন ভাবি, আমাদের সকল নেতাদের কালো চশমা পরা উচিত। চোখ তো শুধুই দেখার জন্য নয়। চোখের ভেতর অন্তর্চক্ষু থাকে। তাই চোখ হচ্ছে হৃদয়ের জানালা, উপলব্ধির পথ। আমাদের দেশ উন্নতির যে তলায় আছে সে বিচারে কালো চশমা ঠুলির কাজ দেবে।

শিশুদের প্রতি একজন অন্ধ ভিক্ষুকের মমতা অনুকরণীয়। তার অন্ধ চোখ ঢাকা থাকলেও হৃদয়ের চোখ বিরাট। দিনের আলো নিভে গেলে রাত আসে, চোখের আলো নিভে গেলে মৃত্যু অবধারিত। তখন পড়ে থাকবে শুধুই চশমা। যার আড়ালের কারণে সমষ্টির স্বার্থকে নিজ স্বার্থ মনে হয়েছে তার দুর্বল ও অসহায় মানুষের দুর্দশাকে পুজি করে নিজের ব্যক্তি পুজি স্ফীত করা হয়েছে।

আমাদের সময় হয়েছে, ব্যরিস্টার ইশতিয়াক, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ও বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিদের চশমা সংরক্ষণ করা। যারা চশমা চোখে সুবজ বাংলাদেশকে সবুজই দেখেছেন, কালো নয়।

ভিয়েনা থেকে

দাগ

– ইমরান হাসান

তিনি খুব ভালো কৃকেট খেলতেন। তার ডাক নাম শান্ত, পুরো নাম হাশিবুল হোসেন। পাচ ফিট ছয় ইঞ্চির লম্বা এক যুবক। গায়ের রঙ শ্যামলা। মুখটা একটু গোল টাইপের। হাসলে বাম গালের মাঝে সামান্য একটু টোল পড়ে। দারুণ হাসিখুশি স্বভাবের। তার মনে যেন কোনো দুঃখ নেই। সবসময় তার মুখে হাসি যেন লেগেই থাকে।

১৯৯৮ সালে আতুরি আইডিয়াল হাই স্কুল থেকে কমার্স নিয়ে সেকেন্ড ডিভিশনে এসএসসি পাস করেন। শান্ত আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে কখনোই সিনিয়রিটি দেখাননি। আমাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো চলাফেরা করতেন।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হলো তখন রেডিওতে শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফত ভরা গলায় ধারাভাষ্য দিতেন, কুয়ালা লামপুর কিলাত কিলাব মাঠে, *হাসিবুল হোসেন শান্ত এখন যেন অশান্ত, প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে আসছে শান্ত, পরের বল... ।*

চেয়ে দেখতাম তার মুখের দিকে যেন সে নিজেই এখন কিলাত কিলাব মাঠে আর তার পেস বলের ধারালো আক্রমণে কেনিয়ান ব্যাটসম্যান কুপোকাত।

তিনি মাঝে মধ্যে তার পিতার দেয়া নামটা নিয়ে খুব গর্ববোধ করতেন। সেই শান্ত এসএসসি পাস করে আর পড়ালেখা করলেন না। তার স্বপ্ন সোনার হরিণ ধরা। তাই পড়ালেখা ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন দুবাই।

দুবাইতে ছিলেন দুই বছর। দুবাই থেকে আবার দেশে এলেন। কিন্তু তার নিজের মাঝে একটুও পরিবর্তন দেখলাম না। যেই শান্ত সেই শান্ত। আগে দেখেছি মানুষ বিদেশ থেকে দেশে এলে একটু মোটা হয় আবার কিছুটা সুন্দর করে কথা বলে, গুছিয়ে গুছিয়ে কিছু ইংরেজিও বলে। কিন্তু শান্তুর মাঝে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখলাম না।

দেশে এসে শান্ত একটা মোটর সাইকেল কিনলেন। আগে তাকে কখনো মোটর সাইকেল চালাতে দেখিনি। তাদের আত্মীয়ের মাঝে অবশ্য তার বড় চাচার মোটর সাইকেল ছিল। কিন্তু কোনোদিন তাকে চালাতে দেখিনি। দুবাই থেকে এই গুণটা তিনি রপ্ত করেছে। ফলে দেশে এসেই এ ইনডিয়ান হিরো মোটর সাইকেল তিনি কিনেছেন।

বৈশাখ মাসের শেষের দিকের কথা। প্রচণ্ড গরম। দুপুরে জয়দেবপুর বাজার থেকে বাড়িতে যাবার জন্য হেটে টেম্পো স্ট্যান্ডে আসছিলাম। পথের মাঝে শান্তর সঙ্গে দেখা। তিনি তার খালার বাড়িতে গিয়েছিলেন একটা কাজে। আমি তাকে আগে দেখিনি।

তিনি আমাকে ডাক দিলেন, এই ইমরান, কোথায় যাবি?

ডান দিকে তাকিয়ে দেখি শান্ত, চোখে কালো সানগ্লাস পরা। বললাম, বাড়ি যাবো।

শান্ত বললেন, আমার সঙ্গে আয়, এক সঙ্গে চলে যাবো।

এখানে বলা দরকার, তাদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি।

তার কথায় আমিও রাজি হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে মোটর সাইকেলের পেছনে গিয়ে বসলাম। ছুটে চললো আমাদের মোটর সাইকেল। তাকে প্রশ্ন করলাম, কেমন করে মোটর সাইকেল চালানো শিখলেন?

উত্তরে তিনি জানালেন, দুবাইতে এক দোকানে কাজ করতেন। সেই দোকানের মালিকের একটি মোটর সাইকেল ছিল। প্রতি শুক্রবার তাদের সাপ্তাহিক ছুটি থাকলেও তিনি শুধু জুমার নামাজের সময়টুকু ছুটি পেতেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় মালিক তার বাড়ি চলে যেতেন তার জিম্মায় দোকান, মোটর

সাইকেল সব রেখে। তার সঙ্গে একজন পাকিস্তানি থাকতো। সেই পাকিস্তানির কাছ থেকে তিনি মোটর সাইকেল চালানো শিখেছেন।

কথায় কথায় তিনি অন্যমনস্ক হয়ে মোটর সাইকেলের স্পিড না কমিয়েই একটা মোড় ঘুরতে যাবার সময় প্রচণ্ড জোরে একটা রিকশার পেছনে লাগিয়ে দেন। আমি পেছন থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছি এবং শান্ত মোটর সাইকেলসহ রোডের মাঝে হ্যাচড়িয়ে পড়েছেন। আমি কোমরে ও হাটুতে আঘাত পাই। আমার আঘাত তেমন বেশি জোরালো নয়। শান্তও বেচে গেছেন অল্পের জন্য। তার হাত, পা সব ছিলে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়। শান্তর চোখে যে সানগ্লাস ছিল তার একটা ডাট ভেঙে তার বাম কানের একটা অংশে ছিড়ে গেছে। মাথার মাঝে তেমন আঘাত লাগেনি। তবে নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। শান্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পথের লোকজনের সহায়তায় আমাদেরকে গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। শান্ত তখনো অজ্ঞান। আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। তার জ্ঞান ফেরার পর বাড়িতে এসে তার আব্বা আম্মাকে জানাই ঘটনাটা। তারাও ছুটে যান। প্রায় এক মাস হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ বেধে তিনি সুস্থ হন। কিন্তু একটা ক্ষত তার রয়ে যায়। তার বাম কানের উপরের অংশ কাটা থেকে যায় যেই অংশে সানগ্লাসের ডাটা বেধেছিল। এটা তার সানগ্লাস পরার দাগ।

প্রথম প্রথম তিনি আমাদের মাঝে আসতে খুব লজ্জা পেতেন। যদিও আমরা তাকে মুখে কোনো কথা বলতাম না তবুও কোনো কোনো বন্ধু তাকে দেখে মিটমিট করে হাসতো।

এরপর থেকে তাকে কখনো সানগ্লাস কিংবা কোনো রকমের চশমা পরতে দেখিনি। ডাক্তার অবশ্য বলেছিলেন যে, কসমেটিক সার্জারি করালে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা ব্যয় বহুল বিধায় তা আর করা হয়নি।

এখনো তার সেই দাগ রয়ে গেছে। বন্ধু, আপনার অনুমতি না নিয়ে লিখলাম। তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। জানি, আপনি যাযাদির পাঠক। এই লেখা আপনার নজরে আসতেও পারে। বলতে চাই, মাথায় হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল কখনোই চালাবেন না।

বেনগাজী, লিবিয়া থেকে

যৌবনের আবেগ

– মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম প্রিন্স

ঘটনা ২০০৩-এর মার্চ মাসের কাছাকাছি। আমার পাশের গ্রামে একজন মেধাবী তরুণী। লম্বা, ফর্শা, স্মার্ট। এই তরুণী এসএসসি পরীক্ষা দিল। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চমৎকার। এক সময় তাকে ইংরেজি পড়াতাম।

বেশির ভাগ তরুণী চশমা পরে বিভিন্ন কারণে। কেউ কেউ প্রশ্ন করলে বলে, মাথা ব্যথার কারণে চশমা পরি। অনেকে চোখের সমস্যায় চশমা পরে।

কিন্তু যাকে নিয়ে আজকের লেখা, এটি সত্য ঘটনা। তার আমি ছদ্ম নাম ব্যবহার করবো।

তার নাম *অপরাজিতা*।

একদিন অপরাজিতাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কেন চশমা পরো?

সে বললো, আপনি কেন পরেন?

বললাম আমি তো মাঝে মধ্যে পরি। জিয়াউর রহমান সানগ্লাস পরতেন। রাজনৈতিকভাবে জিয়া আমার আদর্শের নেতা। তাই আমিও সানগ্লাস ব্যবহার করি।

তারপর অপরাজিতাকে বললাম, তোমার সোনালি ফ্রেমের চশমা তোমাকে গভীরভাবে মানিয়েছে। কেন পর আমাকে বলতে হবে।

বলার পর সে রহস্যময়ী হাসি আমাকে উপহার দিল। এই রহস্যে ঘেরা হাসির অর্থ দু রকমের।

এক. আমার মাথা ব্যথা নেই, তারপরও চশমা পরি।

দুই. চোখের কোনো রকম সমস্যা নেই, তারপরও চশমা পরি।

এবার আমার মনে কৌতূহল, কেন অপরাজিতা চশমা পরে?

আরেক দিন প্রশ্ন করতেই সে খিলখিল হেসে আমাকে বলে ফেললো, যৌবনের আবেগে চশমা পরি।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার মায়াবী চেহারার দিকে। আমার আর বলার কিছুই থাকে না।

আগামী সপ্তাহে তার এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ হবে। অপরাজিতা তার আবেগ ধরে রাখতে পারবে কি না এটাই দেখার বিষয়।

ভার্কুতা, সাভার, ঢাকা থেকে

একান্ত

– এস.এম দাউদ

চশমার কথা মনে পরলেই আমার মনে জেগে ওঠে এক মজার ঘটনা। তখন আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ১৯৯৮ সাল। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে একাউন্টিংয়ে পড়ছি। আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই একাউন্টিং ভালো বুঝতাম না। ফলে ফার্স্ট ইয়ারে খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি। খুব চিন্তায় পরলাম। বড় ভাইয়া ও বড় আপুদের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা শুরু করলাম।

এর মধ্যে অনেক বড় ভাইয়া ও আপুদের সঙ্গে চেনা–জানা হয়েছে। এদিকে রাজশাহী স্টেডিয়ামে কৃকেট খেলতে এসেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। তাই খেলা দেখতে মাঠে গেলাম। মাঠেই একাউন্টিংয়ে পড়ে এক আপুর সঙ্গে পরিচয় হলো। খেলা দেখার ফাকে তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা হলো।

আপুর নাম জলি। একটা শাদা ফ্রেমলেস চশমা পরেন। তাকে ক্যাম্পাসে দেখেছি। কিন্তু এই মাঠে তাকে ভালোভাবে চিনলাম। নওগাতেই বাড়ি।

আমাদের একই জেলার লোক হিসেবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। তার মুখের সঙ্গে শাদা চশমাটা এতো সুন্দরভাবে মানিয়েছে, দেখলেই যে কারো ভালো লাগবে।

তার চোখ দুটো এবং ভ্রূ জোড়া ছিল খুবই সুন্দর। তাই কথা বলার সময় তার ওই চশমা পরা ডাগর চোখ দুটো খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতাম। আপু আমাকে একাউন্টিং দেখানো শুরু করলেন। সপ্তাহে চার দিন তার সঙ্গে থাকতাম। আমার পড়াশোনারও ভালোই উন্নতি হলো। পড়তাম, কথা বলতাম আর চেয়ে থাকতাম তার চশমা পরা সুন্দর চোখগুলোর দিকে।

এভাবে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। এর মধ্যেই দেখলাম জলিআপুকে আমার কেমন যেন একটু বেশি ভালো লাগতো। দেখা না হলেই তার কাছে ফোন করতাম।

তিনি আমাকে আদেশ, উপদেশ দিতেন।

আমিও দেখলাম, পড়া শেষ হলে আমার সঙ্গে আপু ঘুরতে বের হতেন। অনেক কথা আলোচনা করতাম তার পরিবার সম্পর্কে। তিনিও আমার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে শুরু করলেন।

আমরা ক্যাম্পাসে আসার পরও ক্লাস শেষ হলে ঘুরে বেড়াতাম। জলি তার বন্ধু–বান্ধবীদের ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে আসতো। আমারও খুব ভালো লাগতো তার সঙ্গে পথ চলতে।

এরই মধ্যে আমার বন্ধুরা বলতে শুরু করলো, জলি তোর প্রেমে পড়েছে।

আমি হাসতাম আর বলতাম, তাই কি কখন হয়! সে আমার চেয়ে বড়।

বন্ধুরা বলতো, প্রেমের বাছ-বিচার নেই। ছোট-বড় নেই, জাতি-ধর্ম নেই। প্রেম প্রেমই। তুই দেখিস, আমাদের কথা একদিন সত্যি হবেই।

আমিও দেখতে লাগলাম কতোদূর যাওয়া যায়।

একদিন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলাম জলি আজকে আসবে না। কিন্তু দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে সে আসছে। আমি সবাইকে ফেলে রেখে জলির সঙ্গে পড়তে চলে গেলাম। এক ছাতার নিচে হাটছি। একটু একটু করে ভিজছি। কি যে ভালো লাগছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। আমরা পড়া শেষ করলাম। বললাম, জলিআপু চলুন আমরা একটু ঘরে আসি।

বললো, কোথায় যাবো। এতো বৃষ্টি হচ্ছে।

বললাম, চলেন কোনো রেস্টুরেন্টে যাই। কফি খাবো। বলে আমরা বের হলাম।

কফি খেতে খেতে জলি বললো, জানো শিমুল?

তাকালাম জলির দিকে।

জলি হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে বললো, না থাক।

কিন্তু আমিও না শুনে ছাড়বো না। ভালো মতো তাকালাম তার দিকে। তার লজ্জা মেশানো হাসি, কপলে দুই ভ্রূর মাঝ খাতে ছোট্ট কালো টিপ আর চশমা দিয়ে ঢাকা কালো দুটো চোখ। সব মিলিয়ে জলিকে খুবই সুন্দর লাগছিল। আমি নাছোড়বান্দা। শুনবোই আপনি কি বলতে চান।

জলি অবাক করে দিয়ে বললো, আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করো। আমার বন্ধুরা বলেছে।

একটু রাগান্বিত হয়ে বললাম, কে বলেছে এমন কথা, তার নাম বলুন?

জলি বললো, প্লিজ, মাইন্ড করো না, সে আমার বন্ধু মাসুদ।

এমন ভাব দেখালাম যেন মাসুদের এবার একটা কিছু করবো।

জলি আমাকে অনুরোধের স্বরে বললো, তুমি রাগ করো না, এটা নিয়ে তুমি বেশি কিছু চিন্তা করো না। বলেই অন্য কথাতে চলে গেল।

আমার মনে মনে কি যে ভালো লাগছিল! হয়তো আমার মুখটাও তখন খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সেই দিন আমরা প্রায় চার ঘন্টা কথা বলেছি। তবে সেদিন তাকে বুঝতে দেইনি যে আমিও তাকে খুব বেশি পছন্দ করি। তাকে কোন মুখে বলবো যে, তাকে আমি চাই। আমি যে তার চেয়ে ছোট। এই একটা দ্বিধা আমাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়। এরপরও আমাদের ঘনিষ্ঠতা কমেনি। হয়তো সেও বলতে পারে না কারণ সে আমার চেয়ে বড়।

খোদার কাছে বলতাম, যদি তার সঙ্গে আমার এতো কিছু হলো তাহলে কেন তাকে পাবো না। কেন সে আমার চেয়ে বড় হলো! এর জবাব কোনোদিনও পাবো না।

আমার বন্ধুরা বললো, এভাবে নিজে কষ্ট না পেয়ে জলিকে তুই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

চিন্তা করলাম বলার পরে যদি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাহলে খুবই কষ্ট পাবো।

এর মধ্যে জলিদের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ১৯৯৯ সাল। আমি পরীক্ষার মধ্যেও প্রতিদিন দেখা করতাম। পরীক্ষা শেষ হলো। তারপরও একদিন আমিই জলিকে ফোন করে আসতে বললাম।

জলি এলো। সুন্দর করে সেজে এসেছে। বারোটার দিকে দেখা হলো। ক্যাম্পাসের মধ্যে পুকুরের পাড়ে বসে আমরা কথা শুরু করলাম।

তাকে সিরিয়াসলি বললাম, জলিআপু, আপনাকে নিজের অজান্তেই পছন্দ করে ফেলেছি।

জলি শুধু একটু হাসলো এবং বললো, বাস্তবতা অনেক কঠিন যেখানে আবেগের কোনো স্থান নেই। বাস্তবতা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বলেই জলি উঠে দাড়ালো।

আমিও দাড়ালাম। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় হঠাৎ করেই তার ওই শাদা ফ্রেমলেস চশমার দিকে নজর পরলো। এক টানে চশমাটা খুলে মুচড়ে ভেঙে ফেললাম। তারপরও রাগ কমলো না। পায়ের নিচে ফেলে পুরো কাচগুলো টুকরো টুকরো করে ফেললাম। জলিও দ্রুত হেটে চলে গেল।

আজ অনেক দিন পার হয়ে গেছে। জানি না জলি কোথায় আছে। তবে জলির সেই চশমা ভাঙার কথা আজো ভুলতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে গেলে, জলির কথা মনে হলেই একটা সূক্ষ্ম কষ্ট ছুয়ে যায় যা একান্তই আমার।

লক্ষ্মীকোলা, নওগা থেকে

চোরের সুমতি

– সৈয়দ সালমান

আমার দাদুর সুন্দর একটা চশমা ছিল। চশমাটা ছিল রূপালী ফ্রেমের। আয়নার মতো ঝকঝকে গ্লাস। খুব সুন্দর দেখতে। দাদু চশমাটা পরলে খুব ইয়াং মনে হতো।

আমাদের বাসার সবচেয়ে সামনের রুমটা ছিল দাদুর রুম। অর্থাৎ গেটের সামনেই তার রুম। দাদু ছিলেন অধ্যাপক। কিন্তু অবসর নেয়ার পর প্রায় সারা দিন বই পড়তেন। তার রুমটা ছিল ছোট–খাটো একটা লাইব্রেরি।

একদিন বিকেলে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। কারণ বেশ কিছু দিন ধরে হার্টের অসুখটা বেড়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে কোথা থেকে একটা চোর এসে তার কিছু বই, ঘড়ি এবং চশমাটা নিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে দাদু এ ঘর, ও ঘর খুজে না পেয়ে তখন দেখে বই এবং তার ঘড়ি নেই। তখন বুঝতে পারেন আসল ঘটনাটা কি?

তার কয়েকদিন পর দাদু মারা গেলেন। মাইকে ঘোষণা করা হয়।

মারা যাবার চার দিন পর যখন মিলাদ শুরু হবে তার কিছুক্ষণ আগে একটা লোক এসে দাদুর বই, চশমা ফেরত দিয়ে বলে, আসলে আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তবে তার ঘড়িটা বিক্রি করে ফেলেছি।

মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, দিলেই যখন, এখন কেন?

দাদুর সেই চশমাটা আজও আছে। দাদুর কথা বার বার মা মনে করিয়ে দেন।

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে